দেশ কাল মানুষের আজ কাল পরশু

নাগরিক

দ্বিতীয় বর্ষ ❖ ৩য় সংখ্যা ❖ ১৭ জুন ২০২৫

এই সংখ্যায় থাকছে

- প্রচারসর্বস্ব বিজেপি ‘ র ১১ বছর শাষণের স্বরূপ ২
- দেশের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার কমছে : পৃথিবীতে চতুর্থ বৃহৎ অর্থনীতি হওয়ায় আত্ম সন্তুষ্টির কারণ নেই ৪
- বিজ্ঞানই শেষ কথা বলবে ৬
- ট্রাম্পের নিষেধাজ্ঞা: ভারতীয় ছাত্ররা কি করবে? ৮
- শোক সংবাদ : প্রয়াত ইতিহাসের কথাকার কুমারেশ দাশ ৯
- শান্তির ভাঁওতাবাজি, গাজা, ট্রাম্প ও আমরা ১০
- বেলুচিস্তানে কেন স্বাধীনতার লড়াই ১১
- এলোমেলো কথা : আওয়ামী লীগের কাগমারি সম্মেলন ও মাওলানা ভাসানী ১৩
- ড. ইউনূসের বিদেশ সফর ও মিথ্যাচারের ফুলঝুরি ১৪
- বস্তারে আদিবাসীদের ওপর নৃশংস আক্রমণ প্রসঙ্গে গান্ধিবাদী সমাজসেবক হিমাংশু কুমার ১৬
- কেন্দ্রের জনবিরোধী স্মার্ট মিটার প্রকল্প রাজ্য বাতিল করুক ১৮
- সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা অন্তিম যাত্রার অপেক্ষায় ১৯
- প্রযুক্তির বিস্ময় চেনাব নদীর ব্রিজ কৃতিত্ব কার ? মোদীর ? ২১
- পুরনো লেখা ফিরে পড়া : কার্ল মার্কসের ধর্মচিন্তা ২৩
- স্বাধীনতা সংগ্রামী , আইনজ্ঞ ও মহান দানবীর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ২৫

সম্পাদকীয়

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সমর্থক বৈদেশিক নীতি

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে গাজায় বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষা এবং মানবাধিকার রক্ষায় আনা প্রস্তাবে ভারত ভোটদানে বিরত থাকায় কেন্দ্রীয় সরকারের (বিজেপি সরকার) তীব্র সমালোচনা করেছেন কংগ্রেস এমপি প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। তিনি এই সিদ্ধান্তকে‘লজ্জাজনক ও হতাশাজনক’বলে মন্তব্য করেছেন।

শনিবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্স-এ দেওয়া এক পোস্টে প্রিয়াঙ্কা লেখেন, এই সিদ্ধান্তের কোনও যৌক্তিকতা নেই। প্রকৃত আন্তর্জাতিক নেতৃত্বের জন্য ন্যায়বিচারের পক্ষে দাঁড়ানোর সাহস প্রয়োজন।

প্রিয়াঙ্কা গান্ধী আরও বলেন- যখন বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু একটি পুরো জাতিকে ধ্বংস করে দিচ্ছেন, তখন ভারত কেবল নীরব সমর্থকই থাকছে না, বরং ইসরায়েলের ইরানে হামলা এবং দেশটির শীর্ষ নেতৃত্বকে হত্যার ঘটনাকে সমর্থন দিয়ে দেশটিকে উৎসাহিত করছে। এটি একটি দেশের সার্বভৌমত্বের চরম লঙ্ঘন এবং আন্তর্জাতিক সব নীতিমালার পরিপন্থি।

তিনি লেখেন, এখন পর্যন্ত প্রায় ৬০ হাজার মানুষ নিহত হয়েছেন, যাদের অধিকাংশই নারী ও শিশু। একটিগোটা জনসংখ্যাকেঅবরুদ্ধ করেঅনাহারে মারা হচ্ছে, অথচআমরাকোনওঅবস্থান নিচ্ছি না; এটিঅত্যন্ত দুঃখজনক।

প্রিয়াঙ্কা গান্ধী এই পদক্ষেপকে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ও উপনিবেশবাদ বিরোধী ঐতিহ্যথেকে করুণ পশ্চাদপসরণ হিসেবে আখ্যা দেন। তিনি আরও বলেন- কীভাবে আমরা একটি জাতি হিসেবে আমাদের সংবিধানের নীতিমালা এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল্যবোধ বিসর্জন দিতে পারি; যেগুলো শান্তি ও মানবতার ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে আমাদের অবস্থান গড়ে তুলেছিল।

কংগ্রেসের এই নেত্রী বলেন, ভারত অতীতে বারবার ন্যায়ের পক্ষে সাহসিকতা দেখিয়েছে। আজকের বিভাজিত বিশ্বে আমাদেরউচিত মানবতারপক্ষেআওয়াজ তোলা, সত্য ও অহিংসারপক্ষে নির্ভয়ে দাঁড়ানো।

প্রসঙ্গত, শুক্রবার জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ গাজায় অবিলম্বে এবং স্থায়ী যুদ্ধবিরতির আহ্বানে একটি স্থায়ী প্রস্তাব গ্রহণ করে। এতে ১৪৯টি দেশ প্রস্তাবের পক্ষে ভোটদেয়, ১৯টি দেশ ভোটদানে বিরত থাকে এবং ১২টি দেশ প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোটদেয়। গাজায় ইসরায়েলের নৃশংস. আক্রমণের বিরুদ্ধে ১৪৯ টি দেশ ভোট দিয়েছে। ভারত এই ১৪৯ টিদেশথেকেই বিচ্ছিন্ন হয়েগিয়েছে ! কী অপূর্ব বৈদেশিক নীতি।

সম্পাদক
শান্তনু দত্ত চৌধুরী
সৌর বসু কর্তৃক সীমান্ত পল্লী, শান্তিনিকেতন, বীরভূম, পিন ৭৩১২৩৫ থেকে প্রকাশিত।
ই মেইল : nagorik0240@gmail.com ● ফোন : 80178 04019 / 94340 22512 ● ওয়েবসাইট : nagorik.co.in

প্রচারসর্বস্ব বিজেপি ‘র ১১ বছর শাষণের স্বরূপ

অমিতাভ সিংহ

গত সপ্তাহে কেন্দ্রের বিজেপি পরিচালিত সরকার এগারো বছর পূর্ণ করল। সরকারের মন্ত্রীরা ও বিজেপির নেতারা যথারীতি রং চড়িয়ে ১১ বছরে তাদের সাফল্যের প্রচার করতে শুরু করেছেন। মোদী ও অমিত শাহ ইতিমধ্যে বাংলায় এসে সভা করতে শুরু করেছেন। জানা গিয়েছে প্রতি মাসেই বিজেপির মন্ত্রী ও নেতারা নিয়মিত যাবেন সেইসব রাজ্যে যেখানে নির্বাচন আসন্ন। যেমন বিহার., উত্তরপ্রদেশ,পশ্চিমবঙ্গ।

বিজেপি একটা পুস্তিকা প্রকাশ করে বলেছে এই সরকার গত এগারো বছরে নাকি বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে বিশেষ সাফল্য অর্জন করতে পেরেছে। যেমন পরিকল্পনা তৈরী, স্বাস্থ্যক্ষেত্র, পরিকাঠামোগত উন্নতি, জাতীয় সুরক্ষা, বৈদেশিক নীতি, নারী উন্নয়ন। এ ছাড়াও রয়েছে রাম মন্দির নির্মাণ। ভাবা যায়! একটা দল বা সরকার মন্দির তৈরীকে জনগণের উন্নয়ন বলে গর্ববোধ করছে।

আসুন প্রথমেই দেখে নেওয়া যাক এই বিজেপি সরকার যার মাথায় রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী,তারা বিভিন্নসময়ে কি কি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।

■ বিদেশেভারতীয়দের রাখা কালো টাকা দেশে ফিরিয়ে এনে প্রতিটি ভারতীয়ের Account এ ১৫ লক্ষ টাকা করে জমা করা হবে।

■ বছরে ২ কোটি করে চাকরি দেওয়া হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রয়ত্ত্ব সংস্থায় বহু পদখালি অথচ দেশে বেকারত্বের হার গত ৪৮ বছরে সর্বোচ্চ।

■ পেট্রলও ডিজেলেরমূল্য কমানো হবে।মনমোহন সিংসরকারের সময় আন্তর্জাতিকবাজারে ক্রুড অয়েলবা অপরিশোধিত তেলের দাম খুবই বেড়ে গিয়েছিল। ব্যারেল প্রতি ১৩৮-১৪০ ডলার। তখনও পেট্রোল বা ডিজেলের দাম ৭০ টাকা ছাড়ায় নি।আর এখন এই যুদ্ধের বাজারেও তা ব্যারেলপ্রতি ৭২ ডলার ছাড়ায় নি। মাঝে তা কমে হয়েছিল ৪০ ডলারের আশেপাশে। কিন্তু বিজেপি সরকার তখনও দেশে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম ১০০ টাকার নীচে রাখে নি।এমনকি রাশিয়ার কাছ থেকে অপরিশোধিত তেল ২৬ টাকায় কিনে তা দেশের মানুষকে ১০৬ টাকা লিটার প্রতি বিক্রি করেছে সরকার।

■ বিজেপি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ২০২২ সালের মধ্যে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করে দেওয়ার ব্যবস্থা করবে। তা কি হয়েছে? উল্টে আদানীসহ কয়েকটি কর্পোরেটদের সুবিধা করে দেওয়ার লক্ষে কৃষকবিরোধী তিন কৃষি আইন এনে তাদের পথে বসাতে চেয়েছিল। কৃষকেরা মাসের পর মাস হরিয়ানা দিল্লী সীমান্তে অবস্থান করতে বাধ্য হল। তাদের আন্দোলন ভাঙতে বিজেপি রাস্তায় পেরেক পুঁতে,জলকামান,কাঁদানে গ্যাস চার্জ করে,কংক্রীটের দেওয়াল তুলে আন্দোলন ভেস্তে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। যদিও শেষপর্যন্ত তিন কৃষি আইন প্রত্যাহৃত হয়েছিল। পিএম কৃষাণনিধির সুবিধা দেশের প্রতিটি কৃষক পাবে বলে ঘোষণা করা সত্ত্বেও মুষ্টিমেয় কৃষক এই সুবিধা পেয়েছে। তাদের জন্য নূণ্যতম সহায়ক মূল্যের প্রতিশ্রুতি কি হল? দেশের ৫৫ শতাংশ কৃষক আজ ঋণগ্রস্ত।

■ ২০২২ সালের মধ্যে মুম্বই-আমেদাবাদ বুলেট ট্রেন চলাচল করবে বলে মোদীর ঘোষণা ।কবে তা বাস্তবায়িত হবে তা কেউ জানে না।

■ ২০২২ সালের মধ্যে দেশে প্রতিটি মানুষের পাকা গৃহও তাতে বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যবস্থা সরকার করবে বলে যে ঘোষণা করা হয়েছিল , এখন আর তার কোন উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় না।

■ প্রতিটি ভারতবাসীর জন্য ২০২২ সালের মধ্যে শৌচাগারের প্রতিশ্রুতি কি আদৌ বাস্তবায়িত হয়েছে?

■ ২০২২ সালের মধ্যে দেশের প্রতিটি গ্রামে ইন্টারনেট সংযোগ দেওয়ার প্রকল্প কোথায় গেল?

■ উজলা গ্যাস সিলিন্ডার নিয়ে প্রচুব ঢাকঢোল পেটানো হয়েছিল। পরেদেখা গেল পরেরবার সিলিন্ডার নেওয়ার টাকা এইসব প্রান্তিক আয়ের মানুষের নেই। ফলে তারা আবার ফিরে গেল কাঠকয়লার উনুনে। ব্যর্থ একটা প্রকল্প। অথচ তাদের যদি ভর্তুকি দিয়ে কম দামে সিলিন্ডার দেওয়া হত তাহলে তারা তা নিয়মিত ব্যবহার করতে পারতেন।

■ বিজেপির আমলে অর্থনৈতিক অপরাধী যেমন বিজয়মাল্য, নীরবমোদী, মেহুল চোকসির মত যারা বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের টাকা মেরে দেশ ছেড়ে পালিয়েছিল তাদের দেশে ফিরিয়ে এনে বিচার করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। একজনকেও কি সরকার ফিরিয়ে এনেছেন? বিজয় মাল্য সম্প্রতি জানিয়েছেন দেশ ছাড়ার আগে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী অরুন জেটলীর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। এর অর্থ একটাই তা হল বিজেপি এইসব জালিয়াতকে দেশ থেকে পালাতে সাহায্য করেছিল।

■ বিজেপি সরকারের প্রতিশ্রুতি ছিল ২০২২ সালেরমধ্যে অপুষ্টি দূর হবে। অথচ দেশের ধনীরা দিন দিন ধনী হয়েছে। গরীবেরা দিন দিন গরীব হয়েছে। অসাম্য বেড়েছে বহুগুণ। এবিষয়ে গত সংখ্যার ‘নাগরিক’ - এ বিশদ আলোচনা করেছি। দেশের শিশুদের ওজন ও উচ্চতা বয়সের তুলনায় অনেক কম। তাদের মধ্যে অপুষ্টি বেড়েছে। এমনকি নারীদের মধ্যেও অপুষ্টি দিন দিন বেড়েছে।

■ মোদী বলেছিলেন ২০২২ সালের মধ্যে পাঁচ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনৈতিক শক্তিরদেশ হিসাবে ভারতকে প্রতিষ্ঠিত করবেন। এখনও সেখানে পৌঁছতে অনেক পথ বাকি। আমরা আটকে রয়েছি বড়জোর ৪১৮৬ ট্রিলিয়ন ডলারে। আর আমরা অর্থনৈতিক শক্তি হিসাবে বিশ্বে কোথায় অবস্থান করছি তা পরে আলোচনা করছি।

বিজেপি নির্বাচনের আগে বলেছিল ‘ সবকা সাথ সবকা বিকাশ।’ বস্তুত গত একদশকে আমরা দেখলাম দেশে আয়ের অসাম্য প্রবলতর হয়েছে। ওপরের তলার ১ শতাংশ মানুষের হাতে রয়েছে ৪০ শতাংশ

সম্পদ ও নীচের তলার ৫০ শতাংশ মানুষের হাতে মাত্র ৩ শতাংশ সম্পদ।এতটাই যা ব্রিটিশ আমলের থেকেও বেশী। অথচ নেহেরু ইন্দিরা আমলে এই অসাম্য অনেকটাই কমে এসেছিল। ধনীদের আয় কমিয়ে গরীবের আয় বাড়ানোর ব্যবস্থা হয়েছিল। দেশে একটা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছিল। এই আমলে দেখেছি গৌতম আদানীদের উল্কার গতিতে উত্থান। মুকেশ অম্বানীসহ বহু ধনী ব্যবসায়ীদের সম্পদ বেড়েছে লাফিয়ে লাফিয়ে,বিশেষ করে করোনার সময় যখন দেশের মানুষের চাকরি নেই, করোনার ভয়ে তারা চিন্তিত ঠিক তখনি এইসব অসাধু ব্যবসায়ীরা সরকারের মদতে নিজেদের লাভের মাত্রা বাড়িয়ে নিয়েছে।

ড. মনমোহন সিং সরকারের সময় নেওয়া খাদ্য সুরক্ষা আইনের বলে দেশের ৮১ কোটি মানুষ বিনামূল্যে খাদ্যশস্য পাচ্ছে মোট ১৪০ কোটির মধ্যে। এর অর্থ তো পরিষ্কার যে দেশের অর্ধেকের বেশী মানুষ আজ সরকারের দেওয়া বিনামূল্যে দেওয়া খাদ্যের ওপর নির্ভরশীল। ক্ষুধা সূচকে বিশ্বের ১২৭ টি দেশের মধ্যে ভারত ১০৫ নম্বরে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী অপুষ্টি আমাদের শিশুদের শারীরিক বৃদ্ধি ব্যাহত করছে। তিনভাগের একভাগ শিশু চূড়ান্ত অপুষ্টির শিকার।

নোটবন্দীর সময় মোদী বলেছিলেন এর ফলে কালো টাকা চিহ্নিত করা যাবে। আমরা দেখলাম এই সুযোগে ৯৯.৬ শতাংশ টাকা ব্যাঙ্কে জমা পড়ল।কালোটাকার কারবারিরা নিজেদের কালো টাকা সাদা করে নিয়ে গেল। টাকা বদলের লাইনে দাঁড়িয়ে শতাধিক মানুষ মারা গেলেন। সরকার বলল সন্ত্রাসবাদীরা এর ফলে শেষ হয়ে যাবে। সম্প্রতি ছত্রিসগড় বা পহেলগামের হামলার পর কি তা দেশের মানুষ বিশ্বাস করবেন? গতবছরে ৫২ টি জঙ্গী হামলা হয়েছে। এর ফলে ৩৬ জন সেনা শহীদ হয়েছেন,৫৬ জন সাধারণ মানুষের মৃত্যু ঘটেছে।আহত হয়েছেন অসংখ্য সেনা ও সাধারণ মানুষ। সংবিধানের ৩৭০ ও ৩৫ এ অনুচ্ছেদ বাতিলের পর কাশ্মীর কি শান্ত হয়েছে?

জি.এস.টি'র ভুল রূপায়ণ দেশের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের কোমর ভেঙে দিয়েছে। এমএসএমই সংস্থাগুলি ধুঁকছে। মেক ইন ইন্ডিয়ার শ্লোগান কোথায় গেল ? যে চিন ভারতের ৪০০০ বর্গ কিমি জায়গা দখল করেছে মোদীর আমলে এবং মোদী চিনের নাম পর্যন্ত নিতে ভয় পান সেই চিনের তৈরী পণ্যে বাজার ছেয়ে গেছে। অথচ ২০২০ সালে মোদী ঘোষণা করেছিলেন চিনের পণ্য ভারতের বাজারে ঢুকতে দেবেন না। এই চিনের দেওয়া ফাইটার প্লেন, মিসাইল পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহার করল আর সেই চিনের পণ্যের বাজার বাড়িয়ে চিনের বাণিজ্যকে বাড়াচ্ছে মোদীর বিজেপি।

সারা দেশে ক্রমাগত ঘৃণা ছড়ানোতে এই সরকার চ্যাম্পিয়ন। এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে আরেক সম্প্রদায়ের বিভেদ তৈরীতেও তারা সিদ্ধহস্ত। সামাজিক সম্প্রীতি ধ্বংস হয়েছে এই আমলে, তপশীল জাতি,উপজাতি,আদিবাসী, দলিত ও সংখ্যালঘুরা সমাজের দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হয়েছেন। সবসময় তারা ভয়ের পরিবেশের মধ্যে রয়েছেন। মিথ্যা কারনে তাদের গণধোলাই দিয়ে খুন করা তো বিজেপি শাসিত রাজ্যে জলভাত। বিনাবিচারে পুলিশ দিয়ে এনকাউন্টার করিয়ে নিকেশ করা তো উত্তরপ্রদেশের যোগী সরকারের এক বিনোদনে পরিণত হয়েছে। আরেকটি বিনোদন হচ্ছে বুলডোজার দিয়ে ঘরদোর গুঁড়িয়ে দেওয়া। যদিও আদালতের প্রবল সমালোচনার ফলে ইদানীং তা কমেছে।

নমমি গঙ্গা ও দেশের ১০০ টি স্মার্ট সিটি প্রকল্প ব্যর্থ। করোনাকালে গঙ্গার জলে হাজার হাজার মৃতদেহ ভেসে যেতে দেখা গেছে। রেল সুরক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। বড় রেল দুর্ঘটনার পর রেলমন্ত্রী কে সেজেগুজে রিল ভিডিও তৈরী করে তা ভাইরাল করতে দেখা গেছে। প্রচারসর্বস্ব রেলমন্ত্রীর চোখে মুখে যন্ত্রণার লেশমাত্র নেই।

মনমোহন সিং সরকারের আমলে দেশের জিডিপির বৃদ্ধির হার ছিল গড়ে ৮ শতাংশ। মোদী সরকারের আমলে তা গড়ে ৫ থেকে ৬ শতাংশ। তাতেই কত প্রচারের ঢক্কানিনাদ। গত পঞ্চাশ বছরে সবথেকে নীচে জনগণের সঞ্চয় (পাবলিক সেভিংস)।

সরকার প্রচার করছে তারা নাকি ১৪২ কোটি গাছ লাগিয়েছে। গত ছয় বছরে ৫.০৮ লক্ষ হেক্টর এলাকায় গাছ নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। গত দশ বছরে ১৭৩ লক্ষ হেক্টর জঙ্গলকে পরিকাঠামোগত কাজে লাগানো হয়েছে। ফলে কত কোটি গাছ কাটা পড়েছে তা অনুমান করা যেতে পারে।

দেশকে আদানিদের শপিং মল বানিয়ে তুলতে মোদী সরকার কসুর করেনি। আমেরিকায় জালিয়াতি করার অভিযোগে সেই দেশে গৌতম আদানী ঢুকতে পারছে না। আর মোদী গিয়ে ট্রাম্পকে আদানীর ওপর থেকে গ্রেপ্তারি তুলে নিতে হত্যে দিচ্ছেন। সেবির চেয়ারপার্সন মাধবী পুরী বুচ আদানীদের স্বার্থে কাজ করেছেন তা বিভিন্ন তদন্তে দেখা গেছে।কিন্তু সেই মাধবী পুরী বুচকে সরিয়ে দিতে মোদীর কেন ভয়? দেশের গুরুত্বপূর্ণ বিমানবন্দর ও সমুদ্রবন্দর রক্ষণাবেক্ষণের ভার আদানীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। বিমান সংক্রান্ত নূণ্যতম অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও হিন্দুস্তান এরোনেটিকসকে বঞ্চিত করে রাফায়েল ফাইটার বিমান সরবরাহের বরাত অনিল অম্বানীর সংস্থাকে দেওয়া হয় । মনমোহন সিং এর সময়ে যে মূল্যে রাফায়েল কেনার কথা হয়েছিল তার প্রায় তিনগুণ মূল্যে কেনা হল।

দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থার হাল কতটা খারাপ করোনার সময় তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। অক্সিজেনের অভাবে বহু হাসপাতাল বন্ধ করে দিতে হয়েছিল। প্রতিটি হাসপাতালে বেডের অভাব। হাসপাতালগুলি লক্ষ লক্ষ টাকা ভুয়া বিল করছে অসহায় রোগীর আত্মীয়দের কাছে। সরকারী হাসপাতালগুলির পরিকাঠামো ভেঙে পড়েছিল। আয়ুষ্মান ভারত নামে যে স্বাস্থ্যবীমা সরকার এনেছে তা অম্বানীদের মত কয়েকটি কর্পোরেট বীমা কোম্পানির অধীনে রয়েছে। এদের ক্লেম মেটানোর অনুপাত অত্যন্ত কম। সরকারের কাছ থেকে প্রচুর প্রিমিয়াম নিয়ে বিশাল লাভ করছে আর সাধারণ মানুষ বেসরকারি হাসপাতালে লক্ষ লক্ষ টাকার মেডিকেল বিল চুকিয়ে পথে বসছে।

ভারত প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম সবথেকে বেশী আমদানি করে নিজেরা উৎপাদন না করে। একসময় ভারত সারা বিশ্বকে ওষুধ রপ্তানি করত। এখন এদেশে ওষুধের দাম সবথেকে বেশী।নিম্নমানের ও জাল ওষুধে বাজার ছেয়ে গেছে।ওষুধের কোম্পানিগুলির কাছ থেকে নির্বাচনী বন্ডের নামে কোটি কোটি টাকা তোলাবাজি করে বিজেপি সরকার তাদের নিম্নমানের ওষুধ বাজারজাত করার ও যেমন খুশী দাম বাড়ানোর ছাড়পত্র দিয়েছে।

ভারতের জাতীয় স্বার্থ আজ চরম উপেক্ষিত। কাপুরুষোচিত আত্মসমর্পণ দেখলাম পহেলগামের ঘটনার পর। আক্রমনের আগে পাকিস্তানকে সতর্ক করা এবং আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্দেশে যুদ্ধের মাঝে সংঘর্ষ বিরতি বিনা শর্তে মেনে নেওয়া আমাদের আত্মসম্মানের পরিপন্থী। আরো অপমানকর যেটা , সেটা হল এই সংঘর্ষবিরতি ঘোষণা করলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প, নরেন্দ্র মোদী নয়। কোথায় তার ৫৬ ইঞ্চি ছাতি,দেশবাসী দেখল ছাতি এখন ১৬ ইঞ্চিতে নেমে এসেছে। সারা দেশবাসী তখন ইন্দিরা গান্ধির শৌর্য ও সাহসের ইতিহাস মনে করছিলেন। যে ট্রাম্প নাকি মোদীর জিগরি দোস্ত তিনিও ভারতকে সমর্থন করলেন না। যে রাশিয়ার কাছ থেকে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের সময় তেল নিয়ে রাশিয়াকে যুদ্ধে পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছিল ভারত , সেই রাশিয়াও আমাদের পাশে দাঁড়ালো না। বস্তুত একটাও দেশ আজ আমাদের পাশে নেই।উল্টে আইএমএফ ও এশিয়ান ডেভলপমেন্ট ব্যাঙ্ক পাকিস্তানকে অকাতরে ঋণ দিয়েছে গত সপ্তাহে। আইএমএফ দিয়েছে ১০০ কোটি ডলার বা প্রায় ৯০০০ কোটি টাকা।এডিবি দিয়েছে ৮০০ ডলার বা ৭০০০ কোটি টাকা। ভারত বহু চেষ্টা করেও তা আটকাতে পারে নি। আসলে বিশ্বগুরু আজ বিশ্বগরুতে পরিণত হয়েছে। তাই বিশ্ব আজ ভারতকে আমল দেয় না। আরেকটি প্রমাণ, রাষ্ট্রসংঘ চারটি সন্ত্রাসবাদ বিরোধী কমিটির নেতৃত্বের দায়িত্ব দিয়েছে পাকিস্তানকে। আমেরিকার সেনাকর্তা মাইকেল কুরিলা সম্প্রতি সন্ত্রাসরোধে পাকিস্তান অনন্য সহযোগী হিসাবে বর্ণনা করেছেন। পাকিস্তান সেনাপ্রধান আসিম মুনির আমেরিকা সেনা দিবসে বিশেষ অতিথি হয়ে উপস্থিত থাকবেন। প্রতিদিনই আমেরিকার বিদেশ দপ্তরের মুখপাত্র ভারত পাক সংঘর্ষ বিরতিতে আমেরিকার ভূমিকার কথা প্রচার করছে। আর ট্রাম্প তো এরই মধ্যে তেরবার বুক বাজিয়ে এর পুরো কৃতিত্ব নিয়েছেন। জি ৭ সম্মেলনে কানাডা তো প্রথমে মোদীকে আমন্ত্রণই জানায় নি।একেবারে শেষ মূহুর্তে কোন একটা সমঝোতায় অবশেষে মোদী যাচ্ছেন কানাডায়। এটা কিন্তু চূড়ান্ত অসম্মানকর পরিস্থিতি,তা কি মোদী বোঝেন না ?

আসলে মোদী এক প্রচারসর্বস্ব মানুষ। বিদেশে ক্যামেরার সামনে আসার জন্য অন্য রাষ্ট্রনেতাদের হাত দিয়ে সরিয়ে দিতেও দেখা গেছে। আমেদাবাদে যে বিমান দুর্ঘটনা হল সেখানে গিয়ে তিনি যেভাবে দাঁড়িয়ে ছবি তুললেন তা অত্যন্ত কুরুচিকর বলেই মনে হয়েছে। আসলে তার লজ্জা যেমন নেই তেমনি দায়ও নেই। শুধু প্রচার আর প্রচার। ২০২৫ সালে এসে যখন তিনি দেখলেন সবেতেই ব্যর্থ তখন ২০৪৭ সালের স্বপ্ন ফেরি করা শুরু করলেন। মানুষের মতকে চুরি করে,পেছনের দরজা দিয়ে নির্বাচিত সরকারকে ফেলে ক্ষমতা দখল থেকে একদলীয় শাসন কায়েম করার চেষ্টা , এই এগার বছরের প্রধান সাফল্য বলে উল্লেখ করা উচিৎ। তার সঙ্গে আছে সংবিধানকে পদদলিত করে গণতন্ত্র হত্যার মাধ্যমে এক ফ্যাসিস্ট শাসন চালু করা। সরকারের বিরোধীতাকে রাষ্ট্রবিরোধীতা বলে দেগে রাষ্ট্রদোহ আইনে গ্রেপ্তার করা , বিনাবিচারে কারাগারে বন্দী করে রাখা।মোদী গত ১১ বছরে একটাও সাংবাদিক সম্মেলন করেন নি। কোন অস্বস্তিকর বিষয় বা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটলেই তিনি সন্তর্পণে তা এড়িয়ে যান।জবাবদিহিও করেন না। সর্বদলীয় বৈঠকে উপস্থিত থাকেন না , বিরোধীদের কোনেও প্রশ্নের উত্তর দেন না। বেকারত্ব, নারী নিগ্রহ ও নারী নিরাপত্তা, টাকার অবমূল্যায়ন, বেহাল অর্থনীতি,অর্থনৈতিক বৈষম্য, মনিপুরে হিংসা,পুলওয়ামা বা পহেলগাম হামলার মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তার এজেন্ডায় নেই। কিভাবে পুলওয়ামা ঘটনায় আরডিএক্সের গাড়ী সিআরপি কনভয়ে ঢুকে পড়েছিল বা পহেলগামে জঙ্গী আক্রমণের কোনও তথ্য কেন গোয়েন্দারা দিতে ব্যর্থ হলেন তা জানতে চাইলেই পাকিস্তানি বলে দাগিয়ে দেওয়ার চাতুরি এই প্রথম দেশের মানুষ দেখল।

দেশের সমস্ত স্বয়ংশাসিত প্রতিষ্ঠান,যেমন নির্বাচন কমিশন, সিবিআই, ইডি, আয়কর দপ্তর বিজেপির দলীয় স্বার্থে ব্যবহৃত হচ্ছে দেশের গণতান্ত্রিক বাতাবরণকে দুর্বল করে দিয়ে। তাদের একমাত্র কাজ বিরোধী দলের নেতাদের মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো, দুর্নাম করা ও ভয় দেখানো।

আরেকটা জরুরি কাজ তিনি করেছেন এগারো বছরে তা হল কংগ্রেস আমলের নেওয়া বা তৈরী পরিকাঠামো বা প্রকল্পের ফিতে কাটা ও বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি বিক্রি করা।

ডেকন হেরল্ড সংবাদপত্র একটি সুন্দর কার্টুনের মাধ্যমে মোদীর ১১ বছরের সাফল্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছে দুটি গাজর ঝুলিয়ে। এটাই মোদীর ১১ বছরের সাফল্যের নির্যাস।

দেশের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার কমছে : পৃথিবীতে চতুর্থ বৃহৎ অর্থনীতি হওয়ায় আত্ম সন্তুষ্টির কারণ নেই

সৌর বসু

সম্প্রতি সমগ্র পৃথিবীজুড়ে অনিশ্চয়তা বেড়েই চলেছে। একদিকে ডোনাল্ড ট্রাম্প নিত্য নতুন সমস্যার সৃষ্টি করে যাচ্ছেন অন্যদিকে সমগ্র পৃথিবী জুড়ে যুদ্ধের বিভীষিকা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সম্প্রতি ইসরাইল, ইরানের নিউক্লিয়ার এলাকায় ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে। ইরানের কয়েকজন জেনারেল এবং নিউক্লিয়ার বিজ্ঞানী নিহত হয়েছে।

ইরানের নিউক্লিয়ার ব্যবস্থাপনা আক্রান্ত হয়েছে। ইরানের সঙ্গে ইসরাইলের সম্পর্কের অবনতি ঘটে ১৯ ৭৯ সালে, ইরান ইসলামিক রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার পর। ইসরাইলের সঙ্গে ইরানের টেনশন উত্তরোত্তর কয়েক দশক ধরে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। কিন্তু সম্প্রতি ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয় দফায় ক্ষমতায় আসার পর যে কূটনৈতিক পন্থা অবলম্বন করেছিলেন তাতে মনে হয়েছিল যে ইজরায়েল কোনভাবে ইরানের পরমাণু ব্যবস্থাপনাকে আক্রমণ করবে না। কিন্তু ইসরাইল কতৃক ইরান আক্রমণের পর সেই আশার আলোকটুকু নিষ্প্রভ হয়ে যায়। ইসরাইলের সাম্প্রতিক আক্রমণের পর, ইরান জানিয়েছে যে ওয়াশিংটনের সঙ্গে, ওমানে অনুষ্ঠিতব্য নিউক্লিয়ার বৈঠকে ইরান অংশগ্রহণ করবে না। এটা অত্যন্ত হতাশা ব্যাঞ্জক।

অন্যদিকে ভারত পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ বিরতি চলছে।

কিন্তু যুদ্ধ বিরোধী চলা সত্ত্বেও ভারতবর্ষে পাকিস্তানের প্রতি বিদ্বেষ মূলক মনোভাব কোন অংশে কমেনি বরং বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভারতবর্ষের উগ্র জাতীয়তাবাদী সরকার, পাকিস্তানকে শত্রু খাড়া করে, দেশের মানুষকে ভ্রান্ত জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করে জনপ্রিয়তা অর্জন করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। নরেন্দ্র মোদি দেশের সর্বত্র প্রচার করে বেড়াচ্ছেন যে পাকিস্তান যদি ভারতকে কোন ভাবে উত্যক্ত করে ভারত ছেড়ে কথা বলবে না। পাকিস্তানকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার ক্ষমতা ভারতের রয়েছে। সম্প্রতি নরেন্দ্র মোদি একটি জনসভায় পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে বলেছেন যে হয় শান্তিতে থাকো রুটি খাও না হয় গুলি খাও। এই বর্বরোচিত মনোবৃত্তি ভারতের সহিষ্ণুতার ঐতিহ্যের পরিপন্থী।

আগামী এক বছরের মধ্যে ভারতবর্ষের ছটি রাজ্যে; ,দিল্লি, বিহার,পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা, তামিলনাড়ু এবং আসামে বিধানসভা নির্বাচন। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ তামিলনাড়ু কেরালাতে বিজেপি ক্ষমতাতে নেই। নির্বাচনী প্রচারের কাজ শুরু হয়ে গেছে। নির্বাচনে প্রচারের জন্য সাফল্যের কোন খতিয়ান ভারতীয় জনতা পার্টির হাতে সেভাবে নেই। কারণ দেশ জুড়ে বেকারত্ব, মুদ্রাস্ফীতির ধাক্কায় সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস উঠেছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি হ্রাস পাচ্ছে। সেজন্য পাকিস্তান হয়ে উঠেছে নরেন্দ্র মোদির প্রচারের অন্যতম অস্ত্র। এর আগে ২০১৯ সালে সাধারন নির্বাচনের প্রাক্কালে পুলওয়ামায় সন্ত্রাসবাদী হামলায় ৪০ জন সিআরপি জোয়ান নিহত হয়েছিলেন। সেই সন্ত্রাসবাদী হামলা সেবার নরেন্দ্র মোদি ভারতীয় জনতা পার্টির নির্বাচনী plank হয়ে উঠেছিল। এবারও তার পুনরাবৃত্তি দেখা যাচ্ছে।

বর্তমান পৃথিবীতে নতুন এক উপসর্গ দেখা দিয়েছে। শুল্কযুদ্ধ। ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয় দফায় ক্ষমতায় এসে আমেরিকা কে সর্বশ্রেষ্ঠ হিসেবে দেখতে চান। শুল্কের পাঁচিল তুলে বিদেশি পণ্যের আমেরিকাতে প্রবেশ নিষিদ্ধ করে তার অভিপ্রায় সিদ্ধ করতে চান। তাঁর এই শুল্কনীতির ফলে বৈশ্বিক অর্থনীতি ভারসাম্য হারাচ্ছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই শুল্ক নীতির অভিঘাত এসে পড়েছে। ভারতের অর্থনীতিও আজ সঙ্কটাপন্ন।

পৃথিবীব্যাপী এই অর্থনৈতিক দোলাচলের মধ্যে নীতি আয়োগের প্রাক্তন সিইও সুব্রাক্ষণ্যম জানিয়েছেন যে আই এম এফ এর তথ্য অনুযায়ী ভারত ২০২৫ - ২৬ বর্ষের শেষের দিকে পৃথিবীর চতুর্থ বৃহৎ অর্থনীতি হতে চলেছে। খবরটা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত আনন্দের। কিন্তু কতগুলি প্রশ্ন এখানে থেকে গেছে। প্রথমত আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভান্ডার তথ্য সংগ্রহকারী সংস্থা নয়। তথ্য তারা সংগ্রহ করে থাকে বিভিন্ন এজেন্সি বিভিন্ন দেশের কাছ থেকে। এক্ষেত্রে ভারত যে তথ্য সরবরাহ করেছে তার উপর নির্ভর করেই আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভান্ডারের এই ঘোষণা। এখন ভারতবর্ষের তথ্য সংগ্রহে অনেক ক্ষেত্রেই ত্রুটি থেকে যায় বলে মনে করেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অরুণ কুমার। এছাড়া আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভান্ডারের পূর্বাভাস যে সব সময় সঠিক হয় তাও নয় ।২০০৮ সালে আমরা জানি সমগ্র বিশ্ব ,অর্থনৈতিক মন্দার কবলে পড়েছিল এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভান্ডার সঠিক তথ্য পরিবেশন করতে পারে নি। আমরা জানি যে সম্প্রতি ভারতের লোক সংখ্যা চীনের লোক সংখ্যাকে অতিক্রম করে গেছে। বর্তমানে ভারতের লোক সংখ্যা ১৪০ কোটির বেশি। জনসংখ্যা বেশি হওয়ার দরুন আমাদের সামগ্রিক (aggregate) জিডিপি অনেক বেশি। অন্যদিকে মাথাপিছু আয় ধরলে ভারত ,আমেরিকা ,জার্মানি ব্রিটেন, চীন ,জাপানের থেকে অনেক নিচে অবস্থান করছে। ভারতের সামগ্রিক জিডিপি বেশি হলেও, ভারত কিন্তু একটি দরিদ্র রাষ্ট্র। তৎ সত্ত্বেও ভারতের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার খুব হতাশাজনক নয় , আবার আশা ব্যাঞ্জকও নয় বলে মনে করেন ভারতের রিজার্ভ ব্যাংকের প্রাক্তন গভর্নর অর্থনীতিবিদ রঘুরাম রাজন।

নিউইয়র্ক টাইমস লিখছে যে ১.৪ বিলিয়ন জনসংখ্যা নিয়ে ভারত একটি শক্তিশালী অর্থনৈতিক কর্মশক্তি হয়ে উঠতে পারতো, কিন্তু বর্তমান শুল্ক যুদ্ধ, ,ইউক্রেন রাশিয়ার দীর্ঘ কালীন যুদ্ধের ঘূর্ণাবর্তে , ভারতীয় অর্থনীতি হোঁচট খাচ্ছে।

বিগত কয়েক বছর ধরে শেয়ার বাজারের যে উর্ধ্বমুখী গতি তা ধাক্কা খেয়েছে। বিগত ছয় মাসে লাভের হার কমে গেছে। ডলারের মূল্যে টাকার দর দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। বিগত এপ্রিল থেকে মার্চ পর্যন্ত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ছিল ৮.২শতাংশ । বর্তমানে তা ৫.৪ শতাংশ। যদিও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পূর্বাভাস ছিল ৬.৪ শতাংশ। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বজুড়ে যে অস্থিরতা চলছে , সেখানে বিদেশি বিনিয়োগ কমে আসছে। কারণ বাণিজ্য অস্থিতিশীল হয়ে পড়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এই পরিস্থিতিতে বিনিয়োগের ঝুঁকি খুব বেশি। এছাড়াও হায়দ্রাবাদের কৌটিল্য স্কুল অফ পাবলিক পলিসির বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ রথীন রায়ের মতে ভারতীয় শেয়ারবাজার অতি মূল্যায়িত। সেই কারণে বিদেশিরা এমন জায়গায় অর্থ বিনিয়োগ করতে চাইছেন যেখানে আয়ের পরিমাণ বেশি, যেমন ওয়াল স্ট্রিটে।

ভারতের বর্তমান অনিশ্চিত অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে রিজার্ভ ব্যাংকের প্রাক্তন গভর্নর রঘুরাম রাজন মনে করেন যে শিক্ষাক্ষেত্র, স্বাস্থ্য ক্ষেত্র র উপর অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। কারন

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে যদি আরো উন্নত শিক্ষা দেওয়া হয়, গবেষণার উপর জোর দেওয়া হয় তাহলে ভারত উদ্ভাবনী শক্তি সম্পন্ন দেশ হতে পারবে। তাছাড়া বিশ্বের অনেক দেশই ,তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশি ছাত্রদের উপস্থিতি চাইছে না। সে ক্ষেত্রে আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মান যদি উন্নত করা যায় তাহলে এখানেই ভালো ছাত্র তৈরি করা সম্ভব হবে। তাছাড়া পৃথিবী জুড়ে এখন অর্থনৈতিক নীতি অনেক সুরক্ষিত। সে ক্ষেত্রে নতুন উদ্ভাবনী শক্তির মাধ্যমে শিল্প ক্ষেত্রে প্রসার ঘটানো প্রয়োজন। নতুন নতুন কর্মসংস্থান গড়ে তোলা প্রয়োজন। বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতায় নামতে নতুন নতুন আমদানি বাজার খুঁজে বার করতে হবে। চীনের উপর উচ্চ হারে আমেরিকা শুল্ক স্থাপন করেছে। চীন নতুন বাজারের সন্ধান করবে। সেই সুযোগ আমাদের দেশকে গ্রহণ করতে হবে।

রঘুরাম রাজন মনে করেন আমাদের দেশ এখন আত্ম সন্তুষ্টিতে ভুগছে। পৃথিবীতে আমাদের অর্থনীতি চতুর্থতম এই চিন্তা কে আমাদের সরিয়ে ফেলতে হবে।

আমাদের দেশের বিশাল জনসংখ্যা কে ব্যবহার করতে গেলে নতুন ভাবে চিন্তা করতে হবে। বিভিন্ন নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে সরকারের উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিতে হবে। আমাদের এত বড় অভ্যন্তরীণ বাজার কে বিনিয়োগের উপযুক্ত করে তোলার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উন্নতিকল্পে আরো অনেক বেশি অর্থ ব্যয় করতে হবে। সর্বোপরি আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতকে চীন ,জাপানসহ অন্যান্য উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির প্রতিযোগী প্রতিপন্ন করতে হবে।

বিজ্ঞানই শেষ কথা বলবে

জয়ন্ত বিষ্ণু নার্লিকার

[জয়ন্ত বিষ্ণু নার্লিকার (১৯৩৮-২০২৫) শুধু বিশ্বখ্যাত জ্যোতির্পদার্থবিদই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একাধারে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, কল্প-বিজ্ঞান লেখক ও দেশে বিজ্ঞান-মনস্কতা প্রসারে নিবেদিত-প্রাণ এক অক্লান্ত কর্মী। তাঁর সাম্প্রতিক প্রয়াণে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাই কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁরই একটি মূল্যবান লেখা প্রকাশ করে। এটি'The Hindu'পত্রিকায় ২০১৮ সালে প্রকাশিত হয়েছিল।]

কয়েক বছর আগে আমি দিল্লিতে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলাম; বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দ্রুত অগ্রগতির প্রেক্ষাপটে উদ্ভূত কিছু প্রশ্ন নিয়ে আলোচনাই ছিল সম্মেলনের উদ্দেশ্য। সম্মেলন যত এগিয়ে চললো, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞরা নিজের নিজের বিষয়ে কি করা উচিত সে ব্যাপারে তাঁদের সুচিন্তিত মতামত দিতে থাকলেন। কিন্তু মিটিং যতই এগোতে থাকল, আমার মধ্যে একটা অস্বস্তি ততই বেড়ে উঠতে লাগলো; কিছুর একটা অভাব; অনেকটা নিমন্ত্রণ বাড়িতে খাওয়ার পাতে একটু নুনের অভাবের মতো, অনুভব করতে লাগলাম। যে জিনিসটার ব্যাপারে আমি শুনতে চাইছিলাম, সেই 'বিজ্ঞান-মনস্কতা' নিয়ে কোনো ব্যক্তি উল্লেখ করলেন না। শেষে আমাকে বাধ্য হয়ে বিষয়টা উত্থাপন করতে হলো, শুধু বিজ্ঞানীদের জন্যই নয়, সমস্ত পেশার মানুষের জন্য যেটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

'বিজ্ঞান-মনস্কতা' বলতে আমরা কি বুঝি? জওহরলাল নেহেরু তাঁর The Discovery of India বইয়ে লিখেছেন, 'বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে আধুনিক পৃথিবী আজ বাস্তব সত্যকে মান্যতা দিতে শিখিয়েছে; সেই সাথে শিখিয়েছে তথ্যকে গুরুত্বের সাথে বিচার করতে, প্রচলিত ধ্যানধারণাকে শুধু সংস্কার বলে তা মেনে নিতে অস্বীকার করতে'। তিনি আরও বলেন, 'কিন্তু আজকের দিনে এটা আশ্চর্য লাগে , কিভাবে প্রচলিত প্রথা, সংস্কার ইত্যাদি আমাদের বোধকে গ্রাস করে রেখেছে; এমনকি বুদ্ধিমান মানুষের বিচার বিশ্লেষণ করার ক্ষমতাও লোপ পেয়ে গেছে ..'। নেহেরু শেষ পর্যন্ত এই আশা নিয়ে শেষ করেন যে, 'আমরা যখন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে স্বাধীন হব, তখনই আমাদের চিন্তাশক্তি স্বাভাবিকভাবে কাজ করবে, আমরা গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করতে পারব'।

কোনো পরিবর্তন নেই

কিন্তু হায় ! শেষ অবধি ফল কি দাঁড়ালো ? নেহেরু উল্লেখিত সেই স্বাধীনতার দিন থেকে সত্তর বছর কেটে গেছে , কিন্তু বিজ্ঞান-মনস্কতা কোথায়? এখনও আমরা নিজেদেরকে প্রচলিত সংস্কারের ঘেরাটোপে আটকে রেখেছি; আর যে সব আচার অনুষ্ঠান করতে সময় অপচয় করছি, সেগুলোর সাথে আধুনিক যুগে জীবনযাপনের কোনো সম্পর্ক নেই।

কুসংস্কার প্রসঙ্গে চেক রিপাবলিকের একজন বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান আলোচক জিরিগ্রিগর একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। তিনি দেখেছেন, তাঁদের দেশ যখন সোভিয়েত প্রভাবিত যুগে ছিল, তখন কোন কুসংস্কারের কথা প্রকাশ্যে শোনা যেত না, কারণ এগুলো ছিল রাষ্ট্রের মতবাদের বিরোধী। কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়ার পতন হবার পরে 'মুক্তচিন্তা'র যুগে সমস্ত অবদমিত কুসংস্কার প্রকাশ পেয়ে বিকশিত হয়েছে।

কুসংস্কার বেড়েই চলেছে

এর উপরে আবার আজকের মহাকাশযুগে নতুন নতুন আধুনিক কুসংস্কার গজিয়ে উঠছে। গত শতকের শেষদিকে আমি পোর্তেরিকোর আরেসিবো অঞ্চলে রেডিও টেলিস্কোপ দেখতে গিয়েছিলাম। পোর্তে রিকো, বারমুডা আর ফ্লোরিদা কুখ্যাত বারমুডা ট্রায়াঙ্গেলের ত্রিভুজের তিনটি কোণ। এই বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল এলাকা নিয়ে অনেক কিছু রহস্যময় গল্পকথা চালু; কোনো অজ্ঞাত ক্ষতিকারক শক্তি এখানে নাকি বিরাজ করে। চার্লস বার্লিজ এর লেখা বারমুডা ট্রায়াঙ্গেলের উপরে বইয়ে প্রথম এই সব রোমাঞ্চকর ও ভয়াল ঘটনার কথা চালু হয়। এগুলো যদি সত্যি হয়, তবে সমগ্র বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল

এলাকায় এক অশুভ শক্তি বিরাজ করে। তা নিয়ে অনেক গল্প শোনা যায়; পাইলটরা ওই এলাকা দিয়ে প্লেন নিয়ে যাবার সময় দিকভ্রষ্ট হয়ে মৃত্যুবরণ করে, এর উপর দিয়ে যাবার সময়ে ঘড়ি নাকি বন্ধ হয়ে যায়, ইত্যাদি নানা কথা, যার কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

বইটি বেরোনোর কয়েক বছর পরে ওই এলাকার এই সব ঘটনাবলীর বিজ্ঞানিক ব্যাখ্যা খোঁজার চেষ্টা শুরু হয়। বারমুডা ট্রায়াঙ্গেলের রহস্য ভেদ করার জন্য লরেন্স ডেভিড কুশে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেন। তার গবেষণায় এটাই বেরিয়ে আসে যে, গল্পগুলো হয় ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বলা হয়েছে, নয়তো ঘটনাগুলিকে বিকৃত করা হয়েছে, এর সঙ্গে বেশ কিছু কাল্পনিক প্রমাণ যোগ করা হয়েছে। কাজেই এখন এ কথা জোর দিয়ে বলা যায় যে, বারমুডা ট্রায়াঙ্গেলে কোনো মহাজাগতিক শক্তি বিরাজ করে না। তা সত্যেও বিজ্ঞানী হিসেবে যখনই আমি বক্তৃতার শেষে আমি স্কুল বা কলেজের ছাত্রদের কাছ থেকে প্রশ্ন আহ্বান করি, অনিবার্যভাবে এই প্রসঙ্গ নিয়ে প্রশ্ন আসে বারমুডা ট্রায়াঙ্গেলের ঘটনাবলীর পিছনে রহস্য কি? কিন্তু প্রশ্নকর্তাকে যখন বলা হয় যে ওই এলাকায় কোন ব্ল্যাক হোল নেই, ডার্ক এনার্জি নেই, এমন কি অন্য কোন গ্রহের প্রাণীও লুকিয়ে নেই, তখন তারা বেশ হতাশ হয়ে পরে। এই ব্যাপারে আমি যখন পোর্তো রিকোর সেই মানমন্দিরের যে বিজ্ঞানীর অতিথি হয়ে ছিলাম, তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, স্থানীয় লোকের এই সব প্রশ্নের উত্তরে কি বলে, উনি হেসে বললেন, বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল এখন আর এখানে কোনো আলোচনার বিষয় নয়। তবে, বিষয়টা আমাদের এখানে পর্যটক টানতে সুবিধা করে দিয়েছে।

পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সময়ে ক্ষতিকারক রশ্মির উপস্থিতির ভয়ে আমাদের দেশের অনেক নাগরিকই বন্ধ ঘরের মধ্যে থাকে। আমি একবার জিম্বাবোয়েতে পূর্ণ গ্রহণের সময়ে ছিলাম। আমি ভেবেছিলাম, ওখানেও নিশ্চয়ই আমি গ্রহণের সময় লোকশূন্য রাস্তা, ঘরবন্দি মানুষ দেখবো, যেমন আমাদের দেশে ঘটে। কিন্তু কিছুই দেখলাম না। সম্ভবত সেই দেশের মানুষেরা এই ক্ষতিকারক রশ্মি সমন্ধে একেবারেই অবগত নয়। আবার আমাদের দেশে অনেক রকম টোটকা প্রতিষেধকও পাওয়া যায়। এক উচ্চশিক্ষিত পরিবারের গৃহবধূ একবার আমাকে বলেন, গ্রহণের পরে ফ্রিজের ভেতরে রাখা খাবার জিনিস সব ফেলে দেওয়া উচিত, কারণ গ্রহণের ক্ষতিকারক রশ্মি খাবারদাবার সব নষ্ট করে দেয়। কিন্তু এলাকার এক পুরোহিত এই সমস্যার এক সমাধান তাঁকে দিয়েছেন, তাতে খাবার নষ্ট হবে না। মহিলা আমাকে গর্বের সাথে সমাধান জানালেন, ফ্রিজটা গোবর দিয়ে লেপে রাখতে হবে, তাহলে খাবার নষ্ট হবে না।

আর একটা উদাহরণ দিই। এক কোম্পানির ব্যস্ত অফিসারকে এক দিন প্লেনে ধরে এক জায়গায় যাবার ছিল, কিন্তু পরে জানা গেল, ওই দিনটি যাত্রার জন্য অশুভ। কিন্তু তাঁকে বলা হলো, তার আগের দিনটি যাত্রার জন্য শুভ। কিন্তু আগের দিন ওই অফিসারের অনেক কাজ, ব্যস্ত থাকবেন। তাহলে উনি কি করবেন? উনি আগের দিন ব্যাগ গুছিয়ে পাশের বাড়িতে রেখে দিলেন এবং যাত্রার নিদৃষ্ট দিনে যাবার পথে ওই ব্যাগ তুলে নিয়ে রওনা হলেন। ব্যাগটা এক দিন আগে প্রতিবেশীর বাড়িতে রেখে দেওয়া মানে, উনি আসলে কিন্তু আগের শুভ দিনটিতে যাত্রা শুরু করেছেন। এই চাতুরীটি কিন্তু খারাপ আত্মাকে ঠকানোর জন্য দারুন কার্যকরী !

পুরাণ থেকে

এই সমস্তই অপবিজ্ঞানের কিছু উদাহরণ, যার জন্ম কুসংস্কার থেকে। কিন্তু আমাদের পুরাণের কাহিনী থেকে আরো কিছু কথা উঠে আসে যেগুলো নিয়ে গুরুতর কিছু প্রশ্ন উঠতে পারে। আমাদের বৈদিক পূর্বপুরুষদের বিজ্ঞানের জ্ঞান কি বর্তমান যুগের চেয়েও বেশি ছিল? পুরাণে পুষ্পক রথের কথা, বিশ্বমিত্রের মাঝ আকাশে স্বর্গ সৃষ্টির কথা বা ব্রহ্মাস্ত্র কিংবা ইন্দ্রের শক্তির মত অস্ত্র খুবই বিস্ময়কর। কিন্তু সেই সব কাহিনীর সমর্থনে কোন বিশদ বিবরণ নেই, যা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের আতশ কাচে পাশ করে যায়। এসব দাবির পিছনে যদি যুক্তিগ্রাহ্য বিবরণ থাকত তবে এর সমর্থকরা নিশ্চয়ই তাদের প্রযুক্তির বিবরণ দিত। যেমন, পুস্পক রথের মত যান কিভাবে মাটি থেকে শূন্যে উঠে যেত ও বাতাস কেটে এগিয়ে যেত, তার গাণিতিক তত্ত্ব নিশ্চয়ই পাওয়া যেত। আবার ব্রহ্মাস্ত্র যদি একটি পারমানবিক অস্ত্র হত, তবে তা বানানোর পিছনে প্রয়োজনীয় নিউক্লিয়ার ফিজিক্স এর তাত্বিক জ্ঞান অবশ্যই সেই সময়ে ছিল। কিন্তু যেগুলি না বুঝলে আমরা নিউক্লিয়ার ফিজিক্স-এ এক পাও এগোতে পারব না, সেই তড়িৎ বা চৌম্বকীয় বলের কোন উল্লেখ আমরা পাই না কেন ? আজকের আধুনিক যুগে কলের জল ও বিদ্যুৎ বেঁচে থাকার ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তা বলে গণ্য করা হয়; রাজনীতির মঞ্চে এগুলি বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়া সমস্ত দলের ইস্তাহারের অঙ্গ। কিন্তু মহাভারত থেকে আমরা জানতে পারি, দুর্যোধনের হস্তিনাপুর প্রাসাদে, বা পাণ্ডবদের বাসস্থান ইন্দ্রপ্রস্থে, কোন খানেই জল বা বিদ্যুতের এরকম কোন ব্যবস্থা ছিল না।

ইদানিং আবার আমাদের দেশে দাবি উঠছে, ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্ব ভুল এবং এটা স্কুলে পড়ানো যাবে না। বিজ্ঞানের জগতে কোন একটি তত্ত্বের টিকে থাকার একমাত্র শর্ত হল , তাকে এই সম্পর্কিত সমস্ত বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের ব্যাখ্যা দিতে হবে। বর্তমান যুগে, এই বিষয়ে অন্য পাঁচটা তত্ত্বের চেয়ে ডারউইনের তত্ত্বই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ, যদিও তা সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেনি। তার মূল কারণ, পৃথিবীতে প্রাণের উৎপত্তি নিয়ে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা বিজ্ঞান এখনও দিতে পারে নি। কাজেই এব্যাপারে যতদিন না যুগান্তকারী আবিষ্কার হচ্ছে, বা কোন বিকল্প তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক সমর্থন পাচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত ডারউইনের তত্ত্বই একমাত্র গ্রহণযোগ্য তত্ব ও তাকে বিদ্যালয় স্তরে পড়িয়ে যেতে হবে।

শেষ বিচারে, বৈজ্ঞানিক প্রমাণই শেষ কথা বলবে।

(অনুবাদ সিদ্ধার্থ সেন , প্রাক্তন অধ্যাপক , আই.আই.টি)

ট্রাম্পের নিষেধাজ্ঞা: ভারতীয় ছাত্ররা কি করবে?

অশোক সরকার

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ গবেষণা জার্নাল নেচার একটি সূচক তৈরি করে, যার নাম নেচার ইনডেক্স। প্রাকৃতিক ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের দুনিয়ায় সবচেয়ে প্রভাবশালী গবেষণাগুলি কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরচ্ছে তার হিসেব করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে র‍্যাঙ্ককরা হয়। এই সূচকেদুনিয়ারপ্রথমদশটি বিশ্ববিদ্যালয়েরনয়টিহল চিনের,তবেসবচেয়ে উপরে আছেহার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়। চিনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির গবেষণা সবই চিনা বিজ্ঞানীদের করা, কিন্তু হার্ভার্ডের গবেষণাগুলির লেখক অভিবাসী বিজ্ঞানীরা। অন্য দেশ থেকে আমেরিকায় এসে পড়াশোনা করে কর্মসূত্রে হার্ভার্ডে আছেন। অনেকেই হার্ভার্ডে তাদের গবেষণা শুরু করেছিলেন।

এই কথাগুলি বলছি কারণ ট্রাম্প প্রশাসন বিদেশি ছাত্র ছাত্রীদের হার্ভার্ডে পড়তে আসায় নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে, যা আপাতত আদালতের নির্দেশে মুলতুবী আছে। তবে তাই নিয়ে অনিশ্চয়তা এখন চরমে। বিদেশি ছাত্রদের আসার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরও ব্যাপক আকার নিয়েছে কারণ ট্রাম্প প্রশাসন ছাত্র ভিসার সংখ্যাই অনেক কমিয়ে দিয়েছে।

আমাদের তাতে মাথাব্যাথার কি কোনো কারণ আছে? আছে , কারণ আমেরিকায় অন্য দেশ থেকে যত ছাত্র পড়তে যায় তার মধ্যে ভারত আর চীনের অংশ সবচেয়ে বেশি। ২০২৩-২৪ সালে ভারত থেকে আমেরিকায় পড়তে গেছে ৩ লক্ষ ৩১ হাজার ছাত্র, আর চিন দেশ থেকে পড়তে গেছে ২ লক্ষ ৭৭ হাজার। ওই সালেরই হিসেব অনুযায়ী মোট ১১ লক্ষ ছাত্র ছাত্রী অন্য কোনো দেশ থেকে আমেরিকায় পড়তে গেছে। ভারত চীন বাদ দিলে অন্য কোনো দেশ থেকে পড়তে যাওয়া ছাত্র ছাত্রীদের সংখ্যা ৫০ হাজারেরও কম।৺১৷

অর্থাৎ ট্রাম্প প্রশাসনের এই নিষেধাজ্ঞায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ভারতীয় ও চিনা ছাত্র ছাত্রীরা।

এই ছাত্ররা কারা? কেনই বা আমেরিকায় পড়তে যাওয়ার এত হুজুগ? ট্রাম্প প্রশাসন কেন বিদেশি ছাত্রদের পড়তে আসা বন্ধ করতে চাইছে? এতে কার কতটা ক্ষতি হতে পারে? আসুন দেখি এই সব প্রশ্নের কি উত্তর পেতে পারি।

আমেরিকায় যে ১১ লক্ষ বিদেশি ছাত্র ছাত্রী পড়তে যায় তার তিনের চতুর্থাংশ এশিয়া থেকে। ভারত চিনের পরেই আছে দক্ষিণ কোরিয়া, তারপর কানাডাকে বাদ দিলে আছে তাইওয়ান, তারপরেই আছে ভিয়েতনাম , বাংলাদেশ ইত্যাদি।

এশিয়ার কি বিশেষত্ব আছে, যে আমেরিকায় পড়তে যাওয়া ছাত্রদের তিন চতুর্থাংশ এশিয়া থেকে? এই ১১ লক্ষ ছাত্র যে সবাই স্কলারশিপ নিয়ে পড়তে যাচ্ছে তা নয়, ৯০ ভাগই পুরো ফি এবং থাকা খাওয়ার খরচা দিয়ে পড়তে যাচ্ছে। যে সব বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ছাত্ররা পড়তে যায়, তার প্রথম ২০টির মধ্যে ১২টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। আমেরিকান আর বিদেশি ছাত্রদের পড়ার ফি আলাদা, বিদেশিদের জন্য তা অনেক বেশি। ২০২৩-২৪ সালে এই ফি থেকে আমেরিকার ৪৭ বিলিয়ন ডলার আয় হয়েছে। পড়ার খরচার নানা হিসেব পাওয়া যাচ্ছে। বিভিন্ন কোর্স অনুযায়ী তা বছরে ২৬,০০০ থেকে ৫০,০০০ হাজার ডলার পর্যন্ত। টাকার অঙ্কে বছরে ২২ থেকে ৪২ লাখ টাকা। বিএসসি আর ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তেই বেশি ছাত্র যায়, অর্থাৎ ৪ বছরে খরচা ৮৮ লাখ থেকে এক কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ এশিয়ার এই সব দেশগুলিতে এই পরিমাণ অর্থ ও আরও আনুষাঙ্গিক খরচা দিয়ে আমেরিকায় পড়তে পাঠানোর মত একটি শ্রেণী আছে। শুধু টাকা দিলেই হয় না। যোগ্যতাও লাগে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়ে ‘পাস’ করতে হয়। এশিয়ার এই সব দেশগুলিতে আন্তর্জাতিক সিলেবাসে পড়ার ব্যবস্থা আছে, যেখানে পড়লে তা সম্ভব হয়। অর্থাৎ আমেরিকায় পড়তে পাঠানোর জন্য উপযুক্ত শিক্ষা পরিকাঠামো তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি সামাজিক মানসিকতাও তৈরি হয়েছে। গত তিরিশ বছরে ভারত ও চিনে নিঃসন্দেহে একটি শ্রেণির হাতে সম্পদ ও অর্থ এতটাই জমা হয়েছে যে তাঁরা তাঁদের সন্তানদের জন্য দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ শিক্ষা ব্যবস্থার সুযোগ নিতে চাইছেন।

এঁরা কারা? এঁরা সমাজের আধুনিক শিক্ষিত পেশাদার শ্রেণি -- তথ্যপ্রযুক্তি, ফাইনান্স, ডাক্তারি, আইন, প্রাইভেট ব্যাংকিং পেশায় যুক্ত অথবা শিল্পপতিদের এক অংশ। আর্থিক উদারীকরণ নীতির ফলে ভারতের জনসংখ্যার যে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশের সত্যিই তরক্কি হয়েছে, এঁরা সেই অংশের মানুষ। এঁদের ছেলেমেয়েরা ছোটবেলা থেকেই সামাজিক মানসিকভাবে তৈরি হয় বিদেশে যাবার জন্য। ব্যাঙ্গালোরে ১০ বছর কাটানোর সুবাদে এই রকম কিছু মানুষকে সচক্ষে দেখেছি। এঁদের ছেলে মেয়েরা ইন্টারনাশানাল স্কুলে পড়ে, অথবা আন্তর্জাতিক বোর্ডের সিলেবাস পড়ানো হয় এমন স্কুলে পড়ে, তারপর বিএসসি বা ইঞ্জিনিয়ারিং করতে আমেরিকায় চলে যায়। বেশিরভাগই শিক্ষা শেষে আন্তর্জাতিক কোম্পানিতে চাকরি নেয়, এবং আমেরিকাতেই স্থায়ীভাবে থেকে যায়। আমেরিকাতে বসবাসকারী ৫২ লক্ষ ভারত আর ৫৫ লক্ষ চিন থেকে আসা মানুষের একটি বড় অংশ শিক্ষিত অর্থবান এলিট বর্গের মধ্যে পড়ে। তারই প্রতিফলন আমেরিকার রাজনীতিতেও দেখতে পাওয়া যায়। সার্ভেতে দেখা গেছে ভারতীয় আমেরিকানরা এখনো মূলত ডেমক্রাটদের সমর্থন করে, তবে ২০২৪-এর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ট্রাম্পের প্রতি ভারতীয়দের সমর্থন কিছুটা বেড়েছে।৺২৷ চিনাদের ক্ষেত্রেও তাই, গত বছর একটু বেশি সংখ্যায় চিনারা ট্রাম্পকে ভোট দিয়েছেন।

ট্রাম্প প্রশাসনের এই নীতির উদ্দেশ্য কি? বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে কেন তিনি আক্রমণ করতে চাইছেন? এর একাধিক উত্তর আছে। প্রথমত তাঁর সমর্থন বলয় এই ব্যবস্থার সুযোগ নিতে পারে নি। তারা আমেরিকার জনসংখ্যার সেই অংশ যারা

কলেজে পড়তে যায় নি। স্কুল পাশ করে পারিবারিক ব্যবসা বা কোনো রোজগারি কাজে ঢুকে গেছে, কলেজে পড়ার দরকার বোধ করে নি। তারা আমেরিকার বয়স্ক জনসংখ্যার ৬০-৬৫ শতাংশ। দুনিয়াখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রতি এই সমর্থন বলয়ের মানুষগুলির যে বিতৃষ্ণা আছে তার এক নিদর্শন পাওয়া যায় প্রখ্যাত দার্শনিক হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর মাইকেল সান্দাল-এর জবানিতে। ট্রাম্প সমর্থক রাজ্য আইওয়ার এক শহরে হোটেলের লিফটে এক মহিলা কর্মীর সঙ্গে তাঁর দেখা। কোথা থেকে এসেছেন জিগ্যেস করাতে যেই না মাইকেল বলেছেন বোস্টন, সেই মহিলা বলে উঠেছিলেন, তআমরা এখানে লিখতে পড়তে জানি প্রফেসর!দ। তাঁর সমর্থন বলয়কে খুশি করতে গেলে ট্রাম্পকে এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে খোঁচা দিতেই হয়।

শুধু সমর্থন বলয়কে খুশি করাই যদি উদ্দেশ্য হত তাহলে অল্প কিছু খোঁচাতেই কাজ চলত। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বিরুদ্ধে ট্রাম্পের আক্রমণ অনেক গভীর ও ব্যাপক। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি আমেরিকায় চিরকালই স্বাধীন ভাবনার আঁতুড়ঘর হিসেবে পরিচিত, ট্রাম্প বিরোধী কণ্ঠস্বরের এক মূল্যবান বাহক হল এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেই ভারত বা চিনের ছাত্র গবেষকরা শিক্ষালাভ করে, এবং তারপরে বিশ্বের প্রথম সারির গবেষণা, আবিষ্কার কারিগরিতে অবদান রাখছে যার ফলে আমেরিকার বিজ্ঞান ও কারিগরি আধিপত্য খর্ব হচ্ছে। এই সব বিশ্ববিদ্যালয়ে হওয়া গবেষণালব্ধ ফল সারা দুনিয়ার কাজে লাগছে, শুধু আমেরিকার নয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি থেকে যে সব আন্তর্জাতিক কোম্পানিগুলি লাভবান হচ্ছে, তারা তাদের ব্যবসা সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিচ্ছে যাতে আমেরিকার বিশেষত ট্রাম্পের সমর্থন বলয়ের মানুষগুলি কাজ হারাচ্ছে। এছাড়া আরও একটা গভীর উদ্দেশ্য আছে। ট্রাম্প প্রশাসন চাইছে এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ট্রাম্পের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ভাবনার কণ্ঠস্বর হোক। সেইজন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ চাইছেন তিনি।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপর আঘাত হানার তিনটি অস্ত্র। বিদেশি ছাত্র ছাত্রীদের আসা বন্ধ করা, তাতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আয় কমবে। দ্বিতীয়, কেন্দ্রীয় অনুদান বন্ধ করে দেওয়া। তাতে যে উচ্চ স্তরের গবেষণাগুলি বন্ধ হবে। তৃতীয়ত, বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীন চিন্তার পরিসরকে স্তব্ধ করে দেওয়া যাতে ট্রাম্প বিরোধী কণ্ঠস্বর সাড়া না পেতে পারে। এর ফলে তাঁর আশা বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ট্রাম্পনীতি ও রাজনীতির কাছে নত হবে, তিনি তখন এদের নিয়ন্ত্রণে আনতে পারবেন।

কে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে? আমেরিকার প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলি তো সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে গবেষণার সর্ববৃহৎ আর্থিক সহায়তা আসে কেন্দ্রীয় সংস্থা থেকে, ফলে গবেষণা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এই পরিস্থিতি যদি চলতে থাকে তাহলে উচ্চ শিক্ষা জগতে আমেরিকার আধিপত্য কমবে। চিনাদের আধিপত্য বাড়বে। চিনের বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয় ইতিমধ্যেই দুনিয়ার প্রথম ১০০টির মধ্যে উঠে এসেছে, বিজ্ঞানের গবেষণায় তো চিন ইতিমধ্যেই সারা বিশ্বে আধিপত্য বিস্তার করে ফেলেছে।

আমাদের কাছে তার চেয়েও প্রাসঙ্গিক হল আমাদের প্রায় ৩ লক্ষ ছাত্র ছাত্রীর কি হবে? ইতিমধ্যেই দেখা যাচ্ছে যে ইংলন্ডে পড়তে যাবার প্রবণতা বেড়েছে এবং আমেরিকায় যাবার প্রবণতা কমেছে। গত এক বছরেই ১১ু কম ছাত্র আমেরিকায় পড়ার আবেদন করেছে। অর্থাৎ এই প্রবণতা ক্রমশ বাড়বে। ভারতের যে সব স্কুল থেকে এই ছাত্র ছাত্রীরা বিদেশে পড়তে যায়, সেখানে ইউরোপিয়ান ভাষাও পড়ানো হয়, তাই আশা করা যায় ইউরোপের দেশগুলিতেও পড়তে যাবার প্রবণতা বাড়বে।

এই সংকট থেকে ভারতে অতি উচ্চমানের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবী জোরদার হবে এমন সম্ভাবনা কম। এমনকি আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ভারতে তাদের শাখা খুলবে এ হেন সম্ভাবনাও নেই, কারণ ভারতেও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি একই আক্রমণের শিকার। ফলে ভারতের এলিটের দেশ ত্যাগের কাহিনী চলতেই থাকবে।

(লেখক আজিম প্রেমজি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আই.আই.টি)

শোক সংবাদ

প্রয়াত ইতিহাসের কথাকার কুমারেশ দাশ

সুকুমার মিত্র

আঞ্চলিক ইতিহাসের বিশিষ্ট গবেষক হাবড়ার বাসিন্দা কুমারেশ দাশ গত ১২ জুন গভীর রাতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি উত্তর ২৪ পরগনা ইতিহাস পরিষদ, গোবরডাঙা গবেষণা পরিষদ, গোবরডাঙা রেনেসাঁস ইনস্টিটিউট, বালান্দা প্রত্ন সংগ্রহশালার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। প্রথম জীবনে সোশ্যালিস্ট পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ ছিল বিশিষ্ট নেতা পরিতোষ সরকারের হাত ধরে। তাঁর মৃত্যু সংবাদে সংশ্লিষ্ট মহলে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে তাঁর হাবড়ার হাটথুবার বাসভবনে গিয়ে অনেকে শেষ শ্রদ্ধা জানান। তিনি কিছুদিন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা ইতিহাস পরিষদের মুখপত্র ‘পুরাতনী’ সম্পাদনা করেছেন। পরে তিনি ‘উত্তর ২৪ পরগনা জেলা ইতিহাস পরিগম’ নামক সঙ্ঘ গঠন করেন। তাঁর লেখা গ্রন্থ তিতুমীর, উত্তর ২৪ পরগনা জেলার আঞ্চলিক শব্দ ভান্ডার ইত্যাদি। এছাড়া তিনি ঊনবিংশ শতাধীতে গোবরডাঙ্গা থেকে দাস যোগীন্দ্রনাথ সম্পাদিত ও প্রকাশিত ‘কুশদহ সংবাহিকা’ সাপ্তাহিক পত্রিকাটির নির্বাচিত অংশ সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে বহু পত্র-পত্রিকায় তাঁর আঞ্চলিক ইতিহাস বিষয়ক বহু নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। অশোকনগর প্রেস ক্লাব মৃত্যুর কিছু দিন আগে তাঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে।

শান্তির ভাঁওতাবাজি : গাজা, ট্রাম্প ও আমরা

খগেন্দ্রনাথ অধিকারী

সাম্প্রতিক পাক-ভারত যুদ্ধের আকস্মিক বিরতিতে সারা পৃথিবীর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, ধর্মনিরপেক্ষ ও শান্তিকামী মানুষরা কিছুটা অবাক হলেও, সবাই এই বিরতিকে স্বাগত জানিয়েছেন ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে অনাবশ্যক লোকক্ষয়, সম্পদ ক্ষয় ইত্যাদির যবনিকাপাত ও বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার বৃহত্তর স্বার্থে। এই অবাক হবার মূল কারণ ছিল যে (১) যুদ্ধ বিরতি বিবাদমান দুই পক্ষ ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে কোন পক্ষের মাটি থেকে ঘোষিত হয়নি। (২) এই বিরতি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের দপ্তরে বসে হয়নি। (৩) ভারত বা পাকিস্থান, কোন দেশের রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের কেউ যুদ্ধ বিরতির চুক্তি করেননি। (৪) এই বিরতি ঘোষণা করেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আমেরিকার মাটিতে বসে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাসে এটা একটা অদৃষ্ট পূর্ব্ব ঘটনা।

যাইহোক, এই যুদ্ধ বিরতি ঘোষণার পরপরই রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প দুইটি ঘোষণা করেন। (১) তিনি কাশ্মীরে শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে মধ্যস্থতা করতে রাজী। (২) তিনি গাজায় শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে রাজী। কিন্তু, ট্রাম্পের এই ঘোষণা শান্তিকামী কোন মানুষকে উৎসাহিত করতে পারেনি। কারণ, ট্রাম্পের ঘোষণার মধ্য দিয়ে তাঁর রক্তমাখা নখদাঁত সব কিছুই বার হয়ে গেছে। তিনি কানাডাকে প্রস্তাব দিয়েছেন আমেরিকার ৫১তম প্রদেশ হওয়ার। সেটা হলে আমেরিকা কানাডাকে ক্ষ্মগোল্ডেন ডোমক্ষ্ম প্রকল্প অনুসারে সমস্ত রকমের সুরক্ষা দেবে। আর সেটা না হলে বছরে কানাডা আমেরিকাকে ৬২ হাজার কোটি ডলার দিতে বাধ্য থাকবে। (২) এরপর ট্রাম্প বলেছেন যে গ্রীনল্যাণ্ডকে তিনি আমেরিকার অঙ্গরাজ্য করতে চান গ্রীনল্যাণ্ডের উপযুক্ত নিরাপত্তার স্বার্থে। (৩) গাজার ব্যাপারে তিনি বলেছেন যে গাজায় শান্তি প্রতিষ্ঠার স্বার্থে তিনি দশলক্ষ মুসলিম জনতাকে গাজা থেকে বাস্তুচ্যুত করে লিবিয়ায় পুনর্বাসন দেবেন,এতে নাকি গাজায় শান্তি ফিরে আসবে। কারণ, গাজার মুসলিমরাও মুসলিম, আবার লিবিয়ার মুসলিমরাও মুসলিম। এই ধর্মীয় ঐক্যবোধ লিবিয়ার জনগণ ও বাস্তুচ্যুত গাজার জনগণের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানের বাতাবরণ তৈরী করবে। অন্যদিকে উক্ত দশলক্ষ মুসলিম জনগণ গাজা থেকে লিবিয়ায় স্থানান্তরিত হলে গাজা একটা ক্ষ্মইহুদি প্রধানক্ষ্ম অঞ্চলে পরিণত হবে। এক ধর্মীয় লোকের বাসস্থান হবার ফলে সেখানে শান্তি বিরাজ করবে।

বুঝুন, কি ভয়ঙ্কর যুক্তি ট্রাম্পের। মানুষে মানুষে ধর্মীয় নৈকট্যটাই কি সব? তাদের ভাষা, খাদ্যাভাস, সংস্কৃতি, জলবায়ুর প্রভেদ, এ সবের কোন মূল্য নেই? তাহলে কেন পাকিস্থান ভাঙ্গলো? পূর্ব্ব ও পশ্চিম উভয় পাকিস্থানেই মুসলিমরা প্রধান। তবু কেন পাকিস্থান ভাঙ্গলো? বাঙালী ও অবাঙালী মুসলিমরা কেন একসাথে থাকতে পারলেন না ধর্মীয় অভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও? এর উত্তর সারা পৃথিবীর বিবেকবান মানুষের কাছে জানা থাকলেও বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পসহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাণ্ডারীদের জানা নেই।

সবশেষে, অতি সম্প্রতি নিরাপত্তা পরিষদের মোট ১৫ সদস্যের মধ্যে ১৪ সদস্য দেশ সর্ব্ব সম্মতভাবে গাজায় যুদ্ধ বিরতি প্রস্তাব এনেছে। একমাত্র স্থায়ী সদস্য আমেরিকা সেই প্রস্তাবে ভেটো দিয়েছে। সুতরাং ট্রাম্পের শান্তি প্রতিষ্ঠার বুলি মিথ্যার ফুলঝুরি ছাড়া আর কিছুই নয়। মিথ্যা বলে, শান্তির ভণিতা করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সারা পৃথিবীর শান্তিকামী মানুষকে ধোঁকা দিতে চায়। এই ধোঁকাবাজীর বিরুদ্ধে গোটা বিশ্বের ধর্মনিরপেক্ষ শান্তিকামী মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের"Economic and Social Council" এর উপসংস্থা WHO -এর সমীক্ষা অনুযায়ী প্রতি এক মিনিটে কুড়িটি করে শিশু অনাহারে ও অপুষ্টিতে প্যালেস্টাইনে মারা যাচ্ছে। শরণার্থী শিবিরগুলিতে খাদ্যের হাহাকার। সেখানে আমেরিকার মদতে ইসরায়েলী সৈন্যরা প্যালেস্টাইনীদের উপর নির্বিচারে গুলি চালাচ্ছে। প্যালেস্টাইন মুক্তি সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতিশীল দেশগুলির কোন ত্রাণ সামগ্রী বোঝাই জাহাজকে প্যালেস্টাইন ভূখণ্ডের ধারে পাশে ঘেঁসতে দিচ্ছে না ইসরায়েল। আমেরিকার মদতে ইসরায়েল একটানা হুমকি দিয়ে যাচ্ছে যে কোনও দেশ প্যালেস্টাইনের মুসলিম জনগণকে কোনও রকম সাহায্য করতে এগিয়ে এলে বন্দুকের নল দিয়ে তারা তাদেরকে স্বাগত জানাবে।

এইসব হুমকিকে উপেক্ষা করে ইউরোপের একদল মানবাধিকার কর্মী নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ত্রাণ সামগ্রীসহ রওনা দেন প্যালেস্টাইনের উদ্দেশ্যে গাজার প্রান্তরে ও জর্ডানের তীরে। এই সাহসী মিশনের নেতৃত্বে আছেন সুইডেনের পরিবেশ আন্দোলনের নেত্রী গ্রেটা থুর্নবার্গ। তিনি এবং আরও এগারো জন আন্তর্জাতিক স্তরের মানবাধিকার কর্মী ইটালির সিসিলির কাটানিয়া বন্দর থেকে একটি জাহাজে করে ত্রাণ সামগ্রীসহ গাজার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। মার্কিন মদতে ইসরায়েলী কতৃপক্ষ শাসানি দিচ্ছে যে ইসরায়েলের এই নিষেধাজ্ঞাকে অবজ্ঞা করার ফল গ্রেটার ও তাঁর সহকর্মীদেরকে ভুগতে হবে। বলা বাহুল্য যে এই হুমকি আসলে পেন্টাগণের দেওয়া হুমকি।

কিন্তু গ্রেটা ও তাঁর এগারো সহকর্মী অনড়। তাঁরা সব রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে গাজার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন। তাঁর অন্যান্য সহকর্মীরা হলেন ইউরোপীয় পার্লামেন্টের সদস্য রিমা হাসান, ফ্রান্সের ব্যাপতিসঙ আন্দ্রে, নেদারল্যাণ্ডের মার্কোফন রেনেস, ব্রাজিলের থিরাপো আভিলা, জার্মানির ইয়াসেমিন আচার প্রমুখ। তাঁরা ‘ম্যাডলিন’ নামের একটি জাহাজে করে রওনা দিয়েছেন ময়দা, চাল, জলের ফিল্টার, ওষুধপত্র, শিশুর ফরমুলা দুধ, ডায়াপার, স্যানিটারী ন্যাপকিন, চিকিৎসায় বিভিন্ন সরঞ্জাম ও ওষুধপত্র নিয়ে। প্রকাশ থাকে যে কিছুদিন আগে ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে কনসায়েন্স নামে আর একটি ত্রাণবাহী জাহাজ রওনা দিয়েছিল গাজার উদ্দেশ্যে। মার্কিন মদতপুষ্ট ইসরায়েলী সেনাবাহিনী ড্রোন হামলায় জাহাজটির ক্ষতি করে।

সুতরাং কত ঝুঁকি নিয়ে গ্রেটা থুর্নবার্গরা ত্রাণ নিয়ে গাজার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন, তা সহজেই অনুমেয়। এখানেই রয়েছে একাধারে ইসরাইলি জঙ্গীবাদ, ইহুদি আধিপত্যবাদ ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পরাজয় তথা মানবতাবাদের বিজয়ের ইঙ্গিত জর্ডানের তরঙ্গ বিধৌত মাটিতে, গাজার প্রান্তরে।

মনে রাখতে হবে যে উগ্র ধর্মীয় ইসলামী মৌলবাদ (Muslim Brotherhood আলকায়দা, ইসলামিক স্টেট প্রমুখ সংগঠন) সংকীর্ণ ইসলামী ধর্মীয় মৌলবাদের দৃষ্টিকোণে গাজার পাশে তথা প্যালেস্টাইন মুক্তি সংগ্রামের পাশে দাঁড়াতে চেয়েছে। কিন্তু এই সংগ্রামের জনক ইয়াসের আরাফত ইহুদি মৌলবাদ, ইসলামী মৌলবাদসহ সকল ধরনের মৌলবাদের বিরুদ্ধে লড়েছেন। তিনি ভারত সফরে এসে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে বলেছিলেন, ক্ষ্মআপনারা যেমন গঙ্গা যমুনার তীরে শুধু ভারতবাসীর মুক্তির সংগ্রাম লড়েননি, কিংবা মেকং-এর তীরে যেমন ভিয়েৎনামী জনগণ শুধু তাঁদের স্বাধীনতার লড়াই লড়েননি, কঙ্গোবাসী যেমন কঙ্গোর উত্তাল তরঙ্গকে সাক্ষী রেখে শুধু তাঁদেরই স্বাধীনতার লড়াই লড়েননি, আপনারা ও ওনারা সবাই যেমন লড়েছিলেন গোটা মানব জাতির মুক্তির সংগ্রাম, তেমনি জর্ডানের তীরে, গাজার প্রান্তরে, আমরা শুধু প্যালেস্টাইনবাসীর, শুধু প্যালেস্টাইনী মুসলিম অধিবাসীদের মুক্তির সংগ্রাম লড়ছি না। আমরা ইহুদি- খৃশ্চান-মুসলিম নির্বিশেষে সকল ধর্মনিরপেক্ষ মানুষের মুক্তির সংগ্রাম লড়ছি। তাই সুদূর ইউরোপ থেকে গ্রেটা থুর্নবার্গের নেতৃত্বে মানবতার পতাকাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে নারী শিশু- আবালবৃদ্ধ-বণিতা নির্বিশেষে বিপন্ন সকল গাজাবাসীর উদ্দেশ্যে, ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে মানবাধিকার কর্মীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রওনা দিয়েছেন গাজার উদ্দেশ্যে। সেলাম সেলাম, হাজার সেলাম এক সাহসিনী তথা তাঁর সহযাত্রীদেরকে।

কিন্তু দুঃখের কথা, অতীতের আমাদের দেশের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ভূমিকার সব ঐতিহ্যের কথা তথা ভারত-প্যালেস্টাইন মৈত্রীর সকল পরম্পরার কথা নস্যাৎ করে দিয়ে যেভাবে আমাদের দেশের মোদী সরকার মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সেবাদাস হিসাবে নগ্নভাবে কাজ করছে, তা রবীন্দ্রনাথ--নজরুলের মাটির লজ্জা। কঙ্গোর মুক্তি আন্দোলনে মার্কিন বর্বরতার বিরুদ্ধে ১৯৬০ সালে মার্কিন কংগ্রেসের উভয়পক্ষের যৌথ অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী নেহেরু দৃপ্তকণ্ঠে ভাষণ দিয়ে বলেছিলেন, "Where freedom is menaced– justice threatend –we cannot be and shall not be neutral" তাঁর এই দৃপ্ত ভাষণ মুখ চুন করে দেয় সেই সব মার্কিন কর্তাদের যাদের উস্কানিতে মার্কিন কংগ্রেসের সামনে নেহেরুর মার্কিন সফরকে "Begging Mission" (অর্থাৎ নেহেরুর সফর ভিক্ষা যোগাড় করার সফর) প্লাকার্ড হাতে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ছাত্রছাত্রী জমা হয়েছিল। মোদীজীরা ,শাহজীরা হয়তো এসব তথ্য জানেন না। কিন্তু এদেশের তথা গোটা বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মানুষরা একথা জানেন। তাই এঁরা মোদী--শাহ সহ কিংবা সৌদি আরবের পেন্টাগনের তাঁবেদার পেট্রোল ব্যারণ শেখরা সহ, সমস্ত মার্কিন দালালদের বিরুদ্ধে প্যালেস্টাইন মুক্তি সংগ্রাম তথা গাজায় শ্মশান--কবরের শান্তি নয়, প্রকৃত সদর্থক শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এইসব দালালদেরকে বাধ্য করবেন মার্কিন--ইসরায়েল বিরোধী পদক্ষেপ নিয়ে গাজার বুকে জর্ডানের তীরে সদর্থক শান্তি সুনিশ্চিত করতে--এটাই আমাদের দৃঢ় প্রত্যয়।

(লেখক কোলকাতার সাউথ সিটি (দিবা) কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ)

বেলুচিস্তানে কেন স্বাধীনতার লড়াই

মিলন দত্ত

পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বেলুচিস্তানকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করেছেন বিদ্রোহী নেতা ও সাহিত্যিক মীর ইয়ার বালোচ। পাকিস্তান থেকে নিজেদের মুক্ত করার দাবি জানিয়ে বিভিন্ন দেশের হস্তক্ষেপও চেয়েছেন তিনি। মীর ইয়ার বালোচ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এই স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। নিজের এক্স হ্যান্ডেলে বেলুচিস্তান লিবারেশন আর্মির এক ভিডিও শেয়ার করে তিনি লেখেন, আমরা স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিয়েছি। দিল্লিতে দূতাবাস স্থাপন করতে দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি। তাছাড়া আমেরিকার কাছেও বেলুচিস্তানের স্বাধীনতার স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য দাবি জানিয়েছেন তিনি। এছাড়া, টাইমস অফ ইন্ডিয়াকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, বেলুচিস্থান কখনই পাকিস্তানের অংশ ছিল না। আমরা ১৯৪৭ সালের আগেই স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলাম।

তিনি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিমান হামলা, গুম, গণহত্যার অভিযোগ তুলে আন্তর্জাতিক মহলের কঠোর হস্তক্ষেপ দাবি করেন। মীর ভারতের জনগণের উদ্দেশে বলেন, ‘আমরা পাকিস্তানি নই, আমরা বেলুচিস্থানি। আমাদের যেন পাকিস্তানের অংশ হিসেবে দেখা না হয়।’ এদিকে বেলুচ লিবারেশন আর্মির দাবি, তারা ইতিমধ্যে বেলুচিস্থানের ৩০ শতাংশ ভূখন্ড দখল করে নিয়েছে। সম্প্রতি পেহেলগামে সন্ত্রাসী হামলার পর ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কে নতুন করে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। তার ভেতর মীরের দেওয়া এই বক্তব্য এ অঞ্চলের ভূরাজনীতিতে বেশ প্রভাব ফেলবে বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা।

‘পাঞ্জাবিদের শাসন করো, সিন্ধিদের ভয় দেখাও, পশতুদের টাকা দিয়ে কিনে নাও, আর বেলুচদের সম্মান করো।’ ব্রিটিশরা এই নীতিতেই ভারতবর্ষ শাসন করত। তারা জানত, সব জাতিগোষ্ঠীকে একই নিয়মে বশে আনা যায় না। বিশেষ করে দুই গোষ্ঠীকে নিয়ে তাদের মাথাব্যথা ছিল সবচেয়ে বেশি; পশতু আর বেলুচ। তাদের দমানো সহজ নয়। তারা জন্মগতভাবেই বিদ্রোহী। কারও শাসন মানতে চায় না। ব্রিটিশরা প্রথমে চেষ্টা করেছিল শক্তি দিয়ে দখল নিতে। কিন্তু ১৮৪২ সালে কাবুল থেকে তাদের সৈন্যরা

লজ্জাজনকভাবে পিছু হটে। আফগান যুদ্ধের সেই হার তাদের চোখ খুলে দেয়। শুধু বন্দুকের জোরে পশতু আর বেলুচদের দমিয়ে রাখা সম্ভব নয়, তারা বুঝেছিল। তাই তারা কৌশল বদলায়। যুদ্ধের বদলে চুক্তি করে, মোটা অঙ্কের ভাতা দেয়। তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যে নিরুৎসাহিত করে এবং বাধা দিতে থাকে। এক গোত্রকে আরেক গোত্রের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দেয়। সেই ‘ ডিভাইড অ্যান্ড রুল ‘ পলিসি। সবকিছু মিলিয়ে এমন এক চাল চালল, যাতে গোষ্ঠীগুলো নিজেরাই নিজেদের সঙ্গে লড়তে থাকে, ব্রিটিশদের দিকে নজর না দেয়।

এই গোষ্ঠীগুলো যে শক্তিধর, তাদের মানসিকতা যে অন্যান্য গোষ্ঠীর চেয়ে আলাদা, সেটা ব্রিটিশরা পুরোপুরি অস্বীকার করেনি। বরং তারা বলল, ‘এই জাতগুলো যুদ্ধ করতে ভালোবাসে, লড়াই এদের রক্তে মিশে আছে। তাহলে আমরা এদের আমাদের জন্যই লড়াইয়ে নামাই!’ এভাবেই তৈরি হলো পশতুদের নিয়ে ‘পাঠান রেজিমেন্ট’ আর বেলুচদের নিয়ে ‘বেলুচ রেজিমেন্ট’। পরে পাঠান রেজিমেন্টকে একীভূত করা হয় ‘ফ্রন্টিয়ার ফোর্স রেজিমেন্ট’-এর সঙ্গে।

পশতু আর বেলুচ;এই দুই জাতের মানুষই কঠোর নিয়মকানুন মানে। তবে পার্থক্যও আছে। সেটা কোথায়? পশতুদের কাছে ধর্ম ছিল সবচেয়ে বড়। ধর্মের জন্য তারা জীবন দিতেও রাজি। আর বেলুচদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল নিজের ভূমি, নিজের গোত্র আর নিজের সরদার। তাদের কাছে এই তিনটিই ছিল আসল সত্য।

এদের মধ্যে বেলুচদের সামলানো পশতুদের তুলনায় কিছুটা সহজ ছিল। ব্রিটিশরা বুঝতে পারল, গোত্রপ্রধানদের খুশি করতে পারলে গোটা গোত্রকে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। তাই তারা কিছু প্রভাবশালী বেলুচ সরদারকে সম্মান দিল। যেমন কালাতের খান। তাঁর ক্ষমতা বাড়িয়ে দেওয়া হলো, যাতে তিনি অন্য বেলুচ সরদারদের বশে রাখতে পারেন।

এ ছাড়া একটা সুবিধা ছিল। আর তা হলো বেলুচিস্তানের ভৌগোলিক অবস্থান। অঞ্চলটা বিশাল। মরুভূমি আর পাহাড়ে ঘেরা। কোথাও কোথাও যেতে কয়েক দিন লাগত। ফলে এই বিচ্ছিন্ন এলাকায় কেউ কী করছে, ব্রিটিশদের সেদিকে তেমন নজর দিতে হয়নি। বরং তারা একটা সহজ কৌশল নিল;‘তোমরা নিজেরা নিজেরা থাকো, কিন্তু আমাদের বিরোধিতা কোরো না!’

এই নীতির জন্য তারা বেলুচদের অনেক ছাড় দিল। যেমন তাদের অনেক এলাকা প্রশাসনের বাইরে রাখা হলো, মোটা অঙ্কের অনুদান দেওয়া হলো, এমনকি প্রয়োজনে অস্ত্রও দেওয়া হলো! কিন্তু এসবের মধ্যেও কিছু সরদার ছিলেন, যাঁরা ব্রিটিশদের চোখে চোখ রেখে কথা বলতেন। বিশেষ করে মাররি, বুগতি গোত্রের সরদাররা কখনোই পুরোপুরি ব্রিটিশদের বশে আসেননি। তাঁরা ছিলেন চিরকাল স্বাধীনচেতা, লড়াকু।

কিন্তু এটাও নতুন কিছু নয়। এ অঞ্চলে শত শত বছর ধরেই বিদ্রোহ চলে আসছে, লড়াই চলছে। ব্রিটিশরা শুধু সেই পুরোনো যুদ্ধটাকে নিজেদের স্বার্থে নতুন মোড় দিল।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের স্বাধীনতা ব্রিটিশদের পুরোনো শাসনকৌশল এক ধাক্কায় উলটে দিল। নতুন দেশ, নতুন শাসনব্যবস্থা, নতুন নিয়মকানুন। সবকিছুই বদলে গেল। পাকিস্তানে গণতন্ত্রের একটা পরীক্ষা শুরু হলো। আর তার সঙ্গেই বদলে গেল ক্ষমতার ভারসাম্য, নীতি আর সম্পর্কের ধরন।

এর মধ্যেই বেলুচদের মনে নতুন এক ভাবনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল;তাদের সম্মান, স্বাধীনতা আর অস্তিত্ব কি পাকিস্তানের হাতে চলে যাচ্ছে? বেলুচ জাতীয়তাবাদ তখনো খুব শক্তিশালী ছিল না, কিন্তু ‘আঞ্জুমান-ই-ইত্তেহাদ-ই-বেলুচিস্তান’ বা পরে ‘কালাত স্টেট ন্যাশনাল পার্টি’র মতো সংগঠন বেলুচদের মধ্যে নিজেদের আলাদা পরিচয়ের ভাবনা জাগিয়ে তুলছিল।

এরপর একটা ঘটনা সবাইকে সন্দিহান করে তুলল;‘স্ট্যান্ডস্টিল অ্যাগ্রিমেন্ট’। কালাতের খান এ চুক্তিতে সই করলেন। আর পাকিস্তান সরকার এতে লিখল;‘পাকিস্তান সরকার স্বীকার করছে যে কালাত একটি স্বাধীন রাষ্ট্র, যার মর্যাদা ভারতের অন্যান্য রাজ্যের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা।’

এই বাক্য ভবিষ্যতে অনেক প্রশ্নের জন্ম দিল। স্বাধীন রাষ্ট্র হলে কালাত কি পাকিস্তানের অংশ নাকি আলাদা? কিন্তু পাকিস্তান এসব প্রশ্নে খুব একটা মাথা ঘামাল না। তারা সরাসরি চাপে ফেলে ‘ইনস্ট্রুমেন্ট অব অ্যাকসেশন’-এ সই করিয়ে নিল। ফলে বেলুচিস্তান পাকিস্তানের অংশ হয়ে গেল। আর তার প্রতিবাদেই শুরু হলো প্রথম বেলুচ বিদ্রোহ (১৯৪৮-১৯৫০)। এই বিদ্রোহের নেতা ছিলেন প্রিন্স আবদুল করিম। তিনি দোস্ত-ই-ঝালাওয়ান নামের বাহিনী নিয়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরলেন।

পাকিস্তান যতই শক্তি বাড়াচ্ছিল, বেলুচ সরদারদের ক্ষমতা ততই কমছিল। ‘ওয়ান ইউনিট’ নীতির মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানকে একত্র করার পরিকল্পনা করা হলো, যাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাভাষী পূর্ব পাকিস্তানের (বাংলাদেশের) আধিপত্য কমানো যায়। কিন্তু এই নীতিতে বেলুচদের স্বার্থ আরও অবহেলিত হলো।

এত দিন ব্রিটিশরা বেলুচদের সম্মান করেছিল। কারণ, তারা জানত, এই জাত শক্তিশালী, গর্বিত, স্বাধীনচেতা। কিন্তু পাকিস্তানের কাছে বেলুচরা ছিল শুধু প্রাকৃতিক সম্পদের উৎস। বেলুচিস্তানের খনিজ সম্পদ, গ্যাস, খনিগুলো ব্যবহার করা হলো। কিন্তু বেলুচদের জন্য তেমন কিছুই করা হলো না। রাজস্বের ভাগও তারা পেল না। বিনিয়োগও এল না।

ব্রিটিশদের আমলে যাদের সম্মান দেওয়া হয়েছিল, পাকিস্তানের অধীন এসে তারা এখন দেখলে! তাদের শুধু লুট করা হচ্ছে!

পাকিস্তান দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছে, বেলুচ বিদ্রোহ আসলে বাইরের শক্তির ষড়যন্ত্র। একসময় এই ‘বাইরের শক্তি’ বলতে তারা ভারতকে বোঝাত। এখন তারা আফগানিস্তানকেও সেই তালিকায় ঢুকিয়েছে। কিন্তু এ অভিযোগ এখন আর বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না।

বেলুচিস্তানের আন্তর্জাতিক সীমান্ত রয়েছে ইরান ও আফগানিস্তানের সঙ্গে। ইরানের সঙ্গে তাদের ধর্মীয় বিভাজন আছে।

আর আফগানদের সঙ্গে জাতিগত ফারাক। তাই এই দুই দেশ থেকে বড় ধরনের সমর্থন পাওয়ার প্রশ্নই আসে না। বেলুচদের প্রবাসী গোষ্ঠীও খুব শক্তিশালী নয়। আর মধ্যপ্রাচ্যের আরব দেশগুলোও তাদের বিশেষ পাত্তা দেয় না। কারণ, তাদের আন্দোলনে ধর্মীয় কোনো রং নেই। ফলে এটা পরিষ্কার, বেলুচদের বিদ্রোহ পুরোটাই পাকিস্তানের হাতেই তৈরি। বেলুচদের প্রতি পাকিস্তান রাষ্ট্রের অবহেলা, দমননীতি আর নিপীড়নেরই ফল।

'জাফর এক্সপ্রেস' ছিনতাইয়ের ঘটনাও শেষ পর্যন্ত রক্তাক্ত পরিণতিই বয়ে আনবে। তবে তার আগে, বেলুচিস্তান লিবারেশন আর্মি (বিএলএ) আন্তর্জাতিক দৃষ্টি আকর্ষণের যে চেষ্টা করছে। এতে কিছুটা হলেও ফল তো হবেই। অন্যদিকে পাকিস্তান বরাবরের মতো এটিকে 'সন্ত্রাসবাদ' বলেই চালিয়ে দেবে, যেমনটা খাইবার পাখতুনখাওয়া বা বেলুচিস্তানে প্রতিটি বিদ্রোহের পর করে থাকে। কিন্তু নিজেদের দায় স্বীকার করবে না।

পাকিস্তান রাষ্ট্র বরাবরই আত্মপ্রতারণার মধ্যে বাস করেছে। নিজেদের ভুল নীতির কারণে যেসব সমস্যা তৈরি হয়েছে, সেগুলোর জন্য কখনো নিজেদের দায় স্বীকার করেনি। নিজেদের অযৌক্তিক সিদ্ধান্তের কারণে তারা দানব তৈরি করেছে। কিন্তু সেটাকে স্বীকার করার সৎ সাহসও তাদের নেই।

ধীরে ধীরে বেলুচিস্তানের আন্দোলন সর্বাত্মক হয়ে উঠেছে। বেলুচিস্তানে মহিলাদেরও আত্মঘাতী হামলায় যোগ দিতে দেখা যাচ্ছে। তারা বলছে এটা তাদেরও হকের লড়াই। সেখানে স্কুল-হাসপাতাল ভেঙে পড়ছে। ঘরে ভাত নেই। সবচেয়ে বড় উদ্বেগ, গত কয়েক বছরে অন্তত পাঁচ হাজার বেলুচ সংগ্রামী গুম হয়েছে। জাতীয়তাবাদী, রাজনৈতিক কর্মী, সাংবাদিক, ছাত্র এবং এমনকী সাধারণ গুম ও হত্যার অভিযোগ রয়েছ পাক সেনাবাহিনী ও গোয়েন্দাদের বিরুদ্ধে। ফ্রন্টিয়ার কোর (এফসি), গোয়েন্দা সংস্থা এবং কাউন্টার টেররিজম ডিপার্টমেন্ট (সিটিডি) এই ঘটনার নেপথ্যে রয়েছে বলে অভিযোগ। এইচআরসিবি-র মতে, ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে ১৪৪টি গুমের মধ্যে ১০২টির ক্ষেত্রে বাড়িতে সাদা পোশাকে এসে পিকআপ ট্রাক ব্যবহার করে তুলে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা রয়েছে। বছরের পর বছর ঘরের মানুষ ঘরে ফেরার অপেক্ষায় আছে বেলুচ পরিবারগুলি। ২০২৫ সালে গুম ও হত্যার ঘটনা বেড়েছে। গত মার্চ মাসে ১৫১টি গুম এবং ৮০টি হত্যা রেকর্ড করা হয়েছে। কালাত, কোয়েটা এবং গদরে সবচেয়ে বেশি ঘটনা ঘটেছে। বেলুচদের স্বপ্ন স্বাধীন রাষ্ট্র হয়ে ওঠা।

ইতিহাস থেকে আমরা দেখেছি, বেলুচদের সম্মানবোধ কতটা প্রবল। কিন্তু পাকিস্তান কখনই ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয়নি। নিজেদের ভুল স্বীকার করাটাই তাদের কাছে ভয়ানক দুর্বলতা বলে মনে হয়। আর যদি এই অবস্থা চলতে থাকে, তাহলে সামনের দিনগুলোতে অস্থিরতা আরও বাড়বে, এতে সন্দেহ নেই।

এদিকে, চিন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডোর (সিপিইসি) বেলুচিস্তান প্রদেশের গোয়াদর বন্দরকে চিনের জিনজিয়াং প্রদেশের সঙ্গে চিনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ (বিআরআই)-এর কেন্দ্র হিসেবে সংযুক্ত করেছে, তার বাজেট ৬ হাজার কোটি মার্কিন ডলার। সিপিইসির মাধ্যমেই চিনকে গুরুত্বপূর্ণ গোয়াদর বন্দরের মাধ্যমে আরব সাগরে প্রবেশের সুযোগ করে দিয়েছে। বেলুচিস্তানের জনগণ বুঝতে পেরেছে যে চিনের বিনিয়োগের পেছনে রয়েছে তার নিজস্ব অর্থনৈতিক আর ভূ-রাজনৈতিক উদ্দেশ্য। কারণ পাকিস্তানের গোয়াদর বন্দরে চিনের বাণিজ্যিক ও সামরিক স্বার্থ রয়েছে। সময় যত যাচ্ছে চিনের হতাশা বাড়ছে। কারণ গোয়াদরে মাত্র তিনটি সিপিইসি প্রকল্প বাস্তবায়ন হয়েছে। বিপরীতে জল সরবরাহ ও বিদ্যুৎ ব্যবস্থার মতো প্রায় ২০০ কোটি ডলারের এক ডজন প্রকল্প অসমাপ্ত রয়ে গেছে।

এছাড়া চিনের টাকায় গোয়াদরে যে বিশাল বিমানবন্দর তৈরি হয়েছে সেখানে বিশ্বের সবচেয়ে বড় যাত্রীবাহী বিমানও অবতরণ করতে পারবে। ৩ হাজার ৬৫৮ মিটার লম্বা, ৭৫ মিটার প্রশস্ত রানওয়ে নিয়ে এই বিমানবন্দর ব্যবহার করতে পারবে কার্গো বিমানও। কিন্তু ২০১৩ সালে তৈরি সেই বিমানবন্দর আজও ব্যবহার করতে পারেনি চিন বা পাকিস্তান। ফাঁকাই পড়ে রয়েছে। তাছাড়া ওই সমুদ্রবন্দর বা বিমানবন্দর দিয়ে বেলুচদের কোনও সুবিধে হয়নি, হবেও না। বরং এই সব নিয়ে তারা অসুবিধের মধ্যেই আছে।

আজ বেলুচিস্তানের স্বাধীনতার লড়াই স্তব্ধ করায় কেবল পাকিস্তানেরই স্বার্থ জড়িত নয়, চিনও জড়িয়ে পড়েছে। হাজার হাজার কোটি ডলার খরচ করে চিন যে কারাকোরাম এক্সপ্রেস, গোয়াদর সমুদ্রবন্দর এবং বিমানবন্দর নির্মাণ করেছে তার বাণিজ্যির ব্যবহার নিশ্চিত করতে না পারলে চিনের শান্তি নেই। আবার বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ (বিআরআই)-এ গোয়াদরে চিন যে অর্থ বিনিয়োগ করেছে তার প্রায় সবটাই পাকিস্তানের ঋণ। চিন এখন পাকিস্তানের গলায় আঙুল দিয়ে সেই ঋণ আদায় করতে চাইবে। এখন বেলুচিস্তানের স্বাধীনতার লড়াই যতটা পাকিস্তানকে অসুবিধেয় ফেলেছে, ততটাই অসুবিধেয় আছে চিন।

এলোমেলো কথা

আওয়ামী লীগের কাগমারি সম্মেলন ও মাওলানা ভাসানী

শুভ বসু

পৃথিবীর সব দেশের রাষ্ট্র সমাজ এবং অর্থনীতিতে কোনো একটি নির্দিষ্ট পথ থাকতে পারে না। একটি সমাজের, ইতিহাস তার বুদ্ধিজীবীদের রাষ্ট্রীয় চিন্তা এবং অর্থনৈতিক ভারসাম্যের উপর নির্ভর করে সেই দেশের রাষ্ট্র কি ভাবে চলবে। আজকে প্রতীচ্যের রাষ্ট্রীয় এবং অর্থনৈতিক দর্শনের প্রভাবে তাঁদের আধুনিকতা কে একটি

বিশ্বজনীন আধুনিকতা বলে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু পৃথিবী কোনও সমতল নয়। প্রতীচ্যের আধুনিকীকরণের দর্শন আমাদের দর্শন হতে পারে না। মার্ক্সবাদ কিন্তু প্রতীচ্যের আধুনিকীকরনের থেকে তার যাত্রা শুরু করলেও তার বিশ্ব জুড়ে যে সাম্রাজ্য স্থাপনের দর্শন তার প্রতিবাদী দর্শন হিসাবে বিকাশ লাভ করে। ১৮৫৭ র মহা বিদ্রোহ সম্পর্কে নিউ ইয়র্ক ডেইলি ট্রিবিউন এ মার্কসের লেখা গুলো পড়ুন তাহলে এই ধারণা স্পষ্ট হবে। বিম্বিসার এবং অশোক বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহন না করলে বৌদ্ধ দর্শন জৈন দর্শনের মতো একটি একান্ত সীমিত সংখ্যক লোকের দর্শন থেকে যেত সেই রকম রুশ বিপ্লব এবং চিনে বিপ্লব না হলে মার্ক্সবাদ সম্পর্কে আমরা জানতে পারতাম না। আবার মার্ক্সবাদের প্রয়োগ এমন কি যেখানে রাষ্ট্র শক্তি মার্ক্সবাদীদের হাতে রয়েছে ভিন্ন দেশে ভিন্ন ধরণের আকার নিয়েছে। চীনের মার্ক্সবাদ এবং ভিয়েতনামের মার্ক্সবাদ বা কিউবার মার্ক্সবাদ বা ব্রাজিলের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ধারার মার্ক্সবাদ এক নয় কিন্তু সেই বৈচিত্র প্রমাণ করে স্থান কাল প্রাত্র অনুযায়ী মার্ক্সীয় দর্শন প্রয়োগ এবং উপপ্রয়োগের উপর নির্ভর করে।

আমাদের ভারতে বর্তমানে তিনটে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে চলেছে। প্রথমত ভারতের মতো বহু জাতিক রাষ্ট্রে একটি বিশেষ অঞ্চলের মানে গুজরাটি এবং মাড়োয়ারি বণিক গোষ্ঠী একচেটিয়া পুঁজি বিকাশ লাভ করেছে। তাদের সহযোগী দল হিন্দু জাতীয়তাবাদের মোড়কে সেই বাজার দখলের প্রতিযোগিতায় নেমেছে এবং সংযুক্ত রাষ্ট্র কাঠামো বর্জন করে একক রাষ্ট্র কাঠামো গ্রহণ করেছে সেই পুঁজির বিকাশের জন্যে। সেই সঙ্গে সংগঠিত শ্রমিক এবং কৃষক আন্দোলনের উপর নিরন্তর আক্রমণ চালাচ্ছে। দ্বিতীয়ত তারা ধর্মর ভিত্তিতে সংখ্যাগুরু এবং সংখ্যা লঘুর তকমা লাগিয়ে দেশটা ভাগ করতে চায় কারণ তাতে তাদের ভোটব্যাংক তৈরী হয়। এই পরিস্থিতিতে সংখ্যালঘু সমাজের মধ্যে সন্ত্রাসী একটি ধারা তৈরী হয়ে তারা ভারতে সংখ্যাগুরুর ধর্মর উপর আক্রমণ করে, সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ করে সংখ্যাগুরুর আধিপত্য আরো তীব্র করে তুলতে চায়। তৃতীয়ত এই তথাকথিত ধর্মীয় জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে বিশ্ব পুঁজির সম্পর্ক মিত্রতা এবং বৈরিতার। মিত্রতা, কারণ তাদের কে বিশ্বের নানা জায়গায় উৎপাদিত পণ্য রপ্তানি করতে হবে, পুঁজির বিনিয়োগ করতে হবে। আবার শত্রুতা কারণ আজকের বিশ্বের সর্ববৃহৎ পুঁজিবাদী দেশে আর্থিক এবং রাজনৈতিক সংকট দেখা গিয়েছে। তারা বিশ্বতে আর অবাধ বাণিজ্য চায় না কারণটা তাদের বিশ্ব বাণিজ্যে জাতীয় উদবৃত্তের সংকট।

বাম রাজনীতির দ্বায়িত্ব তাদের উদার নৈতিক গণতান্ত্রিক সাংবিধানিক কাঠামো সামলানো। ধর্মীয় বিভাজন কমানো এবং শ্রমিক কৃষক এবং মহিলা আন্দোলন কে বিকশিত করা যাতে করে একটি নাগরিক অধিকার ভিত্তিক সমাজ তৈরী করা যায়। এর মধ্যে ধর্মের সঙ্গে কোনও বিরোধ বাম রাজনীতির নেই। ধর্ম ব্যক্তি মানুষের আধ্যাত্মিক এবং সামাজিক প্রয়োজনের ব্যাপার। তাকে ধারণ করার অধিকার যে কোনো নৃ গোষ্ঠীর রয়েছে শুধুমাত্র তা যেন সংঘাতের রাস্তায় না যায় এটা দেখা প্রয়োজন। দক্ষিণ আমেরিকাতে ক্যাথলিক ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে লিবারেশন থিওলজির উদাহরণ বা বাংলাদেশের রাজনীতিতে এক সময় মাওলানা ভাসানী এর উদাহরণ ছিলেন। মাওলানা ভাসানী সম্পর্কে ভারতে দুটি ভুল ধারণা প্রচলিত রয়েছে এক তিনি ভারত বিরোধী আর দুই তিনি হিন্দু বিরোধী। এখানে ইতিহাসের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা একান্তভাবে স্মরণীয়।

১৯৪৯ সালে বাংলাদেশে আওয়ামী মুসলিম লিগের স্থাপনে মাওলানা ভাসানীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তিনি এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। সেই সময় রোজ গার্ডেনের কনফারেন্সে তরুণ শেখ মুজিবুর রহমান যোগ দিতে পারেন নি কারণ তিনি কারাগারে ছিলেন। দ্বিতীয়ত ১৯৫৫ সালে আওয়ামী মুসলিম লিগকে আওয়ামী লিগে পরিণত করার ক্ষেত্রে তাঁর একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল। বরং সোহরাওয়ার্দি শিষ্য শেখ মুজিবুর রহমান এ বিষয়ে ধীরে চলার পক্ষপাতী ছিলেন, যদিও ১৯৫৪ সালের পর তিনিও এ বিষয়ে মাওলানা ভাসানীর সঙ্গে একমত হন। ভাসানী ১৯৫৪ সালে অলি আহাদ কে চিঠি লিখে বলেন পূর্ব বাংলা থেকে হিন্দু শরণার্থী আসা কমাও। তৃতীয়ত ১৯৫৭ সালের কাগমারিতে আন্তর্জাতিক আফ্রো এশিয়া সাংকৃতিক সম্মেলনের আয়োজন করে মাওলানা ভাসানী নেহেরু - গান্ধি তোরণ করেন এবং ভারত থেকে আধুল ওদুদ, হুমায়ুন কবির, প্রবোধ সান্যাল, রাধারানী দেবী এবং তারাশঙ্করের মতো সাহিত্যিকদের নিমন্ত্রণ করে তিনি আওয়ামী লিগের নেতৃত্বের বিরাগ ভাজন হন। তিনি যখন ন্যাপ গঠন করেন তখন NAP কে তোফাজ্জল হোসেন, মানিক মিয়া এবং শেখ মুজিবুর রহমান নেহেরু এডেড পার্টি বলেন। ইতিহাসের ধারায় মানুষের রাজনৈতিক অবস্থান পরিবর্তন হয়। ১৯৭৬ সালে ফারাক্কার বাঁধের বিরুদ্ধে মাওলানা ভাসানীর লং মার্চ সকলের স্মরণে রয়েছে কিন্তু ১৯৫৭ সালে কাগমারি সম্মেলন বিস্মৃতির অতল গর্ভে তলিয়ে গেছে। মাওলানা ভাসানী কিন্তু তাঁর মাওবাদ ঘেঁষা কৃষিভিত্তিক সাম্যবাদের ধারণায় অচল ছিলেন। ফলে তিনি ছিলেন চীন পন্থী কমিউনিস্টদের সঙ্গে যুক্ত যদিও তাঁদের একাংশ বদরুদ্দীন উমর প্রভৃতি তাঁকে একসময় লেঙ্গি মারে তাঁর ইসলামিক সমাজ তন্ত্রের দর্শনের জন্যে। আমার রাজনৈতিক বক্তব্য আশা করি প্রকাশ করতে পেরেছি।

(লেখক ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক)

ড. ইউনূসের বিদেশ সফর ও মিথ্যাচারের ফুলঝুরি

আলি শরিয়তি

বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে ড. মুহাম্মদ ইউনূস গত দশ মাসে ১১টি দেশ সফর করেছেন। এই মুহূর্তে যুক্তরাজ্যে ১১তম সফর চলছে। আমেরিকা, আজারবাইজান, মিশর, সুইজারল্যান্ড, সংযুক্ত আরব আমিরাত, চীন, থাইল্যান্ড, কাতার, ভ্যাটিকান সিটি, জাপান এবং বর্তমানে যুক্তরাজ্য; প্রধান উপদেষ্টার

এই সফরের তালিকা বেশ দীর্ঘ। যুক্তরাজ্য বাদে বাকী দশটি সফরে প্রায় ২৬০ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে এবং ৭০ দিন সময় অতিবাহিত করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো- এইসব সফরের মাধ্যমে বাংলাদেশ কী অর্জন করেছে?

১১টি সফরের একটিও কোনও দেশের আমন্ত্রণে সফর করেননি ইউনূস। সবগুলো সফরই মূলত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সম্মেলনে যোগদানের জন্য হয়েছে। সুযোগ মতো শুধু চীনের প্রেসিডেন্ট ও জাপানের প্রধানমন্ত্রীর সাথে ছবি তুলেছেন। ফলে খুব স্বাভাবিকভাবেই এইসব সফরে গভর্নমেন্ট টু গভর্নমেন্ট কিছুই অর্জনের সুযোগ নেই।

এরপরেও এইসব সফরকে বাংলাদেশের মিডিয়া ও সরকারের তল্পিবাহকেরা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে প্রচার করেছে যে, বিরাট অর্জন করে ঘরে ফিরেছেন ইউনূস। বাস্তবে যা থ্রি জিরো কিংবা শতাধিক জিরোর সমষ্টি বৈ কিছু নয়।

২.

প্রকৃতপক্ষে এইসব সফরে স্বল্পমেয়াদি প্রচারণা ও ব্যক্তিগত ইমেজ নির্মাণ ছাড়া দেশের জন্য বাস্তবিক অর্জন প্রায় শূন্য। বরং ইউনূসের এইসব সফর অধিকাংশ ক্ষেত্রে পশ্চিমা বিশ্বকে খুশি করা, তাদের স্বার্থ রক্ষা করা, এবং নিজের ব্যক্তিগত প্রচারণা ও ব্র্যান্ডকে বৈশ্বিকভাবে আরও শক্তিশালী করার জন্য হয়েছে বলেই দৃশ্যমান হয়।

আমরা যদি অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখি, তাহলে বড় অর্জনের কথা বলতে গেলে হয়তো জাপানের ১.০৬ বিলিয়ন ডলারের অর্থায়নের কথা আসবে। তবে এটিও শেখ হাসিনা সরকারের আমলে গৃহীত বাংলাদেশের রেল প্রকল্প ও বাজেট সহায়তার ধারাবাহিকতা মাত্র। নতুন কোনও বড় বিনিয়োগ চুক্তি হয়নি। জাপানের এই অর্থায়নও মূলত পূর্বপরিকল্পিত এবং আওয়ামী লীগ সরকারের গৃহীত সিদ্ধান্তের প্রতিফলন মাত্র।

জাপানের আগে চীনের সঙ্গে ৯টি সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে। এরমধ্যে অধিকাংশই সাহিত্য, সংস্কৃতি, ক্রীড়া ও সাংবাদিকতা সংশ্লিষ্ট। বড় কোনো শিল্প প্রকল্প বা বাজার সম্প্রসারণের বিষয়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি। চীন সফরে এসব সমঝোতা স্মারক সই নিয়ে খোদ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) বলেছিল, ‘প্রধান উপদেষ্টার মতো হাই-লেভেল ভিজিটে এসব ছোটখাট চুক্তি সমীচীন নয়’। চীন সফর ও সমঝোতা স্মারক সইয়ের মাধ্যমে বরং চীনের স্ট্র্যাটেজিক আগ্রহের দিকেই বাংলাদেশকে আরও এগিয়ে নেওয়ার বার্তা দিয়েছে মুহাম্মদ ইউনূস।

মধ্যপ্রাচ্য সফরগুলোতেও (কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত) বড় বিনিয়োগ আসার আশ্বাস ছাড়া দৃশ্যমান কিছু আসেনি। সংযুক্ত আরব আমিরাতে শুধু একটি সম্ভাব্য বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক আলোচনা হয়েছে। বাস্তবায়ন অনেক দূরের বিষয়।

কূটনৈতিকভাবে ইউনূসের সফরগুলো রাষ্ট্রের পয়সা খরচ করে তাঁর ব্যক্তিগত গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানোর প্রচেষ্টা ছাড়া ভিন্ন কিছু নয়।

৩.

যুক্তরাষ্ট্রে জাতিসংঘ অধিবেশনে যোগ দিতে গিয়ে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সাথে দেখা করলেন, ছবি তুললেন। কিন্তু বাংলাদেশ কোনো বিনিয়োগ পেয়েছে, বা বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অবস্থান শক্তিশালী হয়েছে তেমনটা প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং একে একে বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের নাগরিকদের যাতায়াত-ভ্রমণ ও অবস্থান আরও কঠিন হবার খবরই পাওয়া যাচ্ছে।

ভ্যাটিকানের সফরে ইউনূস তার থ্রি জিরো দর্শন তুলে ধরলেন। সেখানে তার ব্যক্তিগত কর্মকাণ্ড প্রচার পেলেও বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় কোনো লাভ হয়নি। অথচ সেখানে গিয়েছিলেন পোপ ফ্রান্সিসের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে। ব্যক্তিগত প্রচার চালানোর মাধ্যমে মূলত ‘রথ দেখা ও কলা বেচা’র মতো সফর করলেন।

সর্বশেষ চলমান যুক্তরাজ্য সফরে গিয়ে ‘কিংস চার্লস হারমনি অ্যাওয়ার্ড’ গ্রহণ করার কথা দেশীয় মিডিয়ার মাধ্যমে দেশবাসীকে জানানো হয়েছে। ২০২৪ সালে চালু হওয়া কিংস চার্লস হারমনি অ্যাওয়ার্ডস মূলত বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তিদের বিশেষ সম্মাননা স্বরূপ সম্মানিত করা হয়। ড. ইউনূস এই সম্মাননা পেতেই পারেন। কিন্তু কিংস ফাউন্ডেশনের ওয়েবসাইটে নমিনিদের তালিকায় ড. ইউনূসের নাম না থাকায় সন্দেহ ও সংশয় প্রকাশ পেয়েছে যে, তিনি এই অ্যাওয়ার্ডের জন্য মনোনীত হননি। দেশের মানুষকে বোকা বানানো হয়েছে। এমনকি প্রধানমন্ত্রী কিয়ারস্টার্মার এরসাথে সাক্ষাতের কথাওজানানো হয়েছিল। কিন্তু পরে ইউনূসের তরফ থেকেই জানানো হয়েছে দেখা হবার সম্ভাবনা শূন্য। তাহলে কেন যুক্তরাজ্য সফরে গেছেন?

ধারণা করা যায়, মূলত বিএনপি নেতা তারেক রহমানের সাথে বৈঠক করতেই এই সফর করছেন। একজন দণ্ডিত ও পলাতক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাতে ইউনূসের দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকার ব্যক্তিগত লাভ থাকলেও দেশের কোনও লাভ নেই। তাছাড়া তারেক রহমানকে দেশে ফিরিয়ে এনে ঢাকায় বসেই এই সাক্ষাৎ হতে পারতো। ইউনূস একদিকে তারেক রহমানকে দেশে ফিরতে দিচ্ছেন না, অপরদিকে ক্ষমতায় থাকার জন্য তারেক রহমানের সাথে সাক্ষাৎ করতে লন্ডন সফরে চলে গেলেন রাষ্ট্রের অর্থ অপচয় করে। একেই বলে কাণ্ডজ্ঞানহীন সরকার প্রধান!

৪.

এখন মূল প্রশ্ন হলো, বাংলাদেশের এই কঠিন সময়ে এই বিদেশ সফরগুলো আদৌ দেশের স্বার্থে হয়েছে কি না? যখন রেমিট্যান্সে ধীরগতি, বৈদেশিক ঋণ শোধের চাপ বাড়ছে, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সংকটে রয়েছে- তখন ইউনূসের এই সফরগুলো দেশের অর্থনীতিতে কোনও তাৎপর্যপূর্ণ স্বস্তি আনতে পারেনি।

বরং সফরগুলো ব্যক্তিগত পুরস্কার গ্রহণ, পশ্চিমাদের প্রশংসা কুড়ানো এবং বাংলাদেশকে এক ধরনের ‘ওয়েস্টার্ন প্রক্সি স্টেট’-এ

পরিণত করার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। ড. ইউনূস যেভাবে পশ্চিমাদের এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য নিজেকে ব্যবহার করছেন-তা বাংলাদেশকে আরও পরনির্ভরশীল করে তুলছে।

বিশ্বব্যাপী ওয়াশিংটন-লন্ডন-ব্রাসেলস জোটের স্বার্থের সঙ্গে বাংলাদেশকে মিলিয়ে নেয়ার প্রক্রিয়ায় ড. ইউনূস এখন নিঃসন্দেহে একজন অন্যতম মুখ্য মাধ্যম। এই প্রক্রিয়ায় দেশের সার্বভৌম সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষমতা খর্ব হচ্ছে। তার সফরে কোথাও ভারতের সঙ্গে সীমান্ত সমস্যা, রোহিঙ্গা সংকট বা গঙ্গা-তিস্তা জলবণ্টন চুক্তির মতো জ্বলন্ত ইস্যুগুলো গুরুত্ব পায়নি এবং এসব সমস্যার কোনো অগ্রগতিও হয়নি।

৫

ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বিদেশ সফরের বিস্তারিত নিচে দেয়া হলো-

১ম বিদেশ সফর : ২৩,২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪, নিউইয়র্ক। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭৯তম অধিবেশনে অংশগ্রহণ।

২য় বিদেশ সফর : ১১,২২ নভেম্বর ২০২৪, বাকু, আজারবাইজান। ২০২৪ জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলনে অংশগ্রহণ।

৩য় বিদেশ সফর : ১৮,২০ ডিসেম্বর ২০২৪, কায়রো, মিশর। ডি-৮ সম্মেলনে অংশগ্রহণ।

৪র্থ বিদেশ সফর : ২১,২৫ জানুয়ারি ২০২৫, ডাভোস, সুইজারল্যান্ড। বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামে অংশগ্রহণ।

৫ম বিদেশ সফর : ১৩,১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, দুবাই, সংযুক্ত আরব আমিরাত। ওয়ার্ল্ড গভর্নমেন্ট সামিটে অংশগ্রহণ।

৬ষ্ঠ বিদেশ সফর : ২৬,৩০ মার্চ ২০২৫, হাইনান এবং বেইজিং, চীন। হাইনানে বোয়াও ফোরাম ফর এশিয়ায় অংশগ্রহণ। এবং বেইজিংয়ে প্রথম দ্বিপাক্ষিক বৈঠক।

৭ম বিদেশ সফর : ৩,৪ এপ্রিল ২০২৫, ব্যাংকক, থাইল্যান্ড। বিম্‌সটেকসম্মেলনে অংশগ্রহণ।

৮ম বিদেশ সফর : ২১,২৫ এপ্রিল ২০২৫, দোহা, কাতার। আর্থনা শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণ।

৯ম বিদেশ সফর : ২৬ এপ্রিল ২০২৫, ভ্যাটিকান সিটি। পোপ ফ্রান্সিসের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ।

১০ম বিদেশ সফর : ২৮ মে-১ জুন ২০২৫, টোকিও, জাপান। ৩০তম নিক্কেই ফোরাম ফিউচার অফ এশিয়ায় অংশগ্রহণ। এবং জাপানের প্রধানমন্ত্রীর সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক।

১১তম বিদেশ সফর : ১০-১৩ জুন ২০২৫, লন্ডন, যুক্তরাজ্য। কি উদ্দেশে এই সফর তা কেউ জানে না।

শেষকথা : অনেকেই বলে থাকেন, ড. মুহাম্মদ ইউনূস বর্তমানে পশ্চিমা লবির একজন ‘সেল-আউট ‘। তাঁর বিদেশ সফরের ফ্ল্যাশি ছবি দেখে বাংলাদেশের উগ্র ধর্মাশ্রয়ী রাজনৈতিক শিবিরের লোকেরা খুব আনন্দ পেতে পারেন; কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে এগুলো বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় স্বার্থের পরিপন্থী।

বাংলাদেশের নীতি-নির্ধারণ এখন যেন ধীরে ধীরে আন্তর্জাতিক এনজিও প্রজেক্টে রূপ নিচ্ছে- যেখানে প্রধান চরিত্র হলেন ড. ইউনূস। দেশীয় গণমাধ্যমে তিনি যেন এক বিশ্বনাগরিক, যার এক পায়ে হোয়াইট হাউজ, আর অন্য পায়ে ডাউনিং স্ট্রিট, কিন্তু বাস্তবে বাংলাদেশের মাটিতে তার শিকড় ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ছে এবং ক্রমাগত মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে গ্রহণযোগ্যতা হারাচ্ছেন আন্তর্জাতিক পরিসরেও।

এসব কি তিনি টের পাচ্ছেন নাকি তাঁর আমাত্যবর্গ অবহিত করছেন? সম্ভবত কোনোটাই হচ্ছে না।

বস্তারে আদিবাসীদের ওপর নৃশংস আক্রমণ প্রসঙ্গে গান্ধিবাদী সমাজসেবক হিমাংশু কুমার

পূবালী রাণা

হিমাংশু কুমার গত ১৮ ই মে, কলকাতার সূর্যসেন ভবনে আয়োজিত এক সভায় বক্তৃতা করেন গান্ধীবাদী ও মানবতাদের পক্ষে প্রথম সারির সংগঠক হিমাংশু কুমার। তাঁর বলার বিষয় ছিল, ‘সাম্প্রতিক বস্তার ও মানবাধিকার।’ এখানে সেই বক্তৃতার একটি প্রতিবেদন তুলে ধরা হল।

হিমাংশু বলছেন এক নৃশংস কাহিনি। এই কাহিনী কোনও গল্প কথা নয়। দেশে ঘটমান বাস্তবের কথা, হিমাংশু বর্ণনা করেছেন। আপাত নিরাবেগ, নির্লিপ্ত তাঁর কণ্ঠস্বর, যে নির্লিপ্তি আসলে এক ভিন্নতর প্রতিবাদের ভঙ্গী, যন্ত্রণাকে আড়ালে রেখে যন্ত্রণাকে তুলে ধরা। হামলা হচ্ছে আদিবাসীদের ওপর, দেশের নানা প্রান্তে, তার মধ্যে ছত্তিশগড়ের আদিবাসীরা বিশেষভাবে আক্রমণের লক্ষ্য । তাঁদের হত্যা করা হচ্ছে। গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ২০০5 সালে ছত্তিসগড়ে বিজেপি সরকার আসার সঙ্গে সঙ্গেই একশটি কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি করে, কর্পোরেটদের হাতে জমি হস্তান্তর করার জন্য। সালওয়া জুডুমের সময় যেমন লক্ষ লক্ষ আদিবাসিকে উচ্ছেদ করা হয়েছিল, এ ঠিক তেমনি। সরকার বলছে, মাওবাদী এবং নকশালবাদীরা সংবিধান বিরোধী। তাই মাওবাদী দমন করার প্রক্রিয়া চলছে সাধারণ মানুষের শান্তির জন্য। হিমাংশু বলছেন, যেখানে নকশাল নেই, মাওবাদী নেই সেখানে কি জনসাধারণের ওপর হামলা হয় না? দেশের অন্য প্রান্তে যেখানে নকশালদের চিহ্নমাত্র নেই, সেখানে কী দমনপীড়ন হচ্ছে না? সিআরপিএফ, পুলিশ, বাকি যে আধা-সামরিক বাহিনী আছে, সেগুলি শুধু মাওবাদীদের জন্য বানানো হয়েছে? সারা দেশজুড়েই যেখানে রাষ্ট্রীয় হামলা জারি আছে আদিবাসীদের ওপর, সেখানে নকশালবাদীদের ওপর দোষ চাপিয়ে দেওয়া কি অসততা নয়? বরং দেখা যাচ্ছে যে এলাকা মাওবাদী-শূন্য সেখানেও জনগণের ওপর রাষ্ট্রের হিংসার প্রভাব সমানভাবে প্রকট।

বুঝতে হবে, স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত সরকার পুঁজিপতিদের জন্য যে ভূমি অধিগ্রহণ করেছে, তার একটাও বিনা বন্দুকে নয়। হাজার হাজার আদিবাসীদের প্রাণের বিনিময়ে। এমন কোনো জায়গা নেই, যেখানে পুলিশ এবং আধা-সামরিক বাহিনীকে ব্যবহার করা হয়নি !

হিমাংশু বলছেন, ‘কাল রাতে আমার সাথী সোনি সোরিরন্ধ্সঙ্গে কথা হয়েছে। সোনি বলেছেন, ২৫০০ সশস্ত্র সৈন্য ফোর্সেস দিয়ে আক্রমণ চালানো হয়েছে। ৩১ জন মাওবাদীকে হত্যা করা হয়েছে। সোনি ঘটনা স্থলে গিয়ে মৃতদের পরিজনদের সঙ্গে কথা বলেছেন। ৭ ই মে, যেদিন ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধ শুরু হল, ঠিক ওই দিনই ছত্তিসগড়ের আদিবাসীদের ওপর ভারত রাষ্টের হামলা হয়েছে। সোনি সোরি প্রকৃত সত্য প্রকাশ করেছেন ছত্তিসগড়ের পুলিশ, সিআরপিএফ, কোবরা, আর তেলেঙ্গানার গ্রে হাউন্ড সামনাসামনি চলে আসে এবং বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়, বিভ্রান্তিবশত, একে অপরের উপর গুলি চালায়, ফলত চার সেনা নিহত হয়। কোনো মাওবাদী হামলা চালায় নি। এরপরে এরা ৩১ জন গ্রামবাসীকে ঘেরাও করে এবং নৃশংসভাবে হত্যা করে। গুলি করার আগে তাদের ওপর পাশবিক অত্যাচার করা হয়। মেয়েদের আঁচড়ে কামড়ে স্তন কেটে নিয়ে, যৌন নির্যাতন করার পর গুলি করা হয়। শিশুদের আছাড় মেরে কিম্বা পাথর ছুঁড়ে হত্যা করা হয়। কোনো এনকাউন্টার হয়নি। ঠান্ডা মাথায় নির্যাতন করে হত্যা করা হয়েছে। সোনি সোরি বলছেন, বস্তারের মহিলারা আমাকে বলেন; তসোনি দিদি, আমরা মরার ভয় করি না। আমাদের ওপর গুলি চালাও, আমরা প্রস্তুত। কিন্তু আমাদের ধর্ষণ কোরো না। আমরা মরতে রাজি আছি, কিন্তু ধর্ষণের যন্ত্রণা সহ্য করতে রাজি নই। কারণ এখানে ধর্ষণই সবচেয়ে ভয়ঙ্কর জিনিস।দ

এদের পরিবারকে মৃতদেহ দেওয়া হয়নি। হাসপাতালে এক সপ্তাহ ধরে মৃতদেহে পচন ধরেছে। মৃতদেহের ওপরে পোকা জন্মে গেছে, ফলে হাসপাতাল ছেড়ে অন্য রোগীরা পালাতে বাধ্য হয়েছে। এক সপ্তাহ পরে ১২ই মে সোনি সোরি গ্রামবাসীদের নিয়ে আধিকারিকের কাছে বিক্ষোভ দেখালে মৃতদেহ পরিবারকে দেওয়া হয়। মৃতদেহকে পোকার চাদর বিছিয়ে ফেরত দেওয়া হয় যাতে পরিবারের লোক তাদের সনাক্ত করতে না পারে ! আমরা এমন একটা দেশে বাস করছি যেখানে আত্মীয় পরিজনের মৃতদেহও লড়াই করে আদায় করতে হয় ! একটা নকল এনকাউন্টার করে নির্মমভাবে তাদের মারা হয়।

নকশালপন্থীরা সংবিধান মানে না, তাই সরকার নকশাল নিধন করে। হিমাংশু ঠান্ডা গলায় বলে চলেছেন, সরকারের কাছে আমার প্রশ্ন আপনারা ভারতের সংবিধানকে মানেন? সংবিধান বলে, বনাধিকার আইন অনুসারে, রাষ্ট্র আদিবাসীদের জমি গ্রাম সভার অনুমতি ব্যাতীত অধিগ্রহণ করতে পারে না। ছত্তিসগড় সরকার পাঁচ হাজার পুলিশকে রাইফেল দেয় (সঙ্গে আধা সামরিক বাহিনী), মাওবাদী দমন করার জন্য।

সিআরপিএফ, বিএসএফ, ছত্তিসগড় পুলিশ , এরা কর্পোরেটের জন্য জমি খালি করতে বলে। গ্রামে আক্রমণ শুরু করে। আদিবাসীদের ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। তারা প্রাণ ভয়ে পালাতে থাকে। যারা পালাতে পারে না, বিশেষ করে মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ , তাদের ওপর নেমে আসে পাশবিক অত্যাচার। নারীদের ধর্ষণ করা হয় বারবার। অনেকে মিলে। তারপর তাদের হত্যা করা হয়, শিশুদের আছাড় মেরে কিম্বা পাথর ছুড়ে হত্যা করা হয়। বয়স্কদেরও হত্যা করা হয়। গ্রামে আগুন লাগানো হয়। খেতের ফসল আগুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। তাদের পানীয় জলের উৎসে বিষ দিয়ে দেওয়া হয়, যাতে সেই জল খেয়ে তাদের অবধারিত মৃত্যু হয়। মৃত্যু ভয়ে ভীত আদিবাসীরা কিছুদিন জঙ্গলে লুকিয়ে থাকার পর যখন ভাবে আবার নতুন করে শুরু করার কথা, আবার তাদের ওপর ধেয়ে আসে রাষ্ট্রীয় হামলা। আবার নতুন নতুন লোকেদের হত্যা, আবার সবকিছু জ্বালিয়ে দেওয়া। হিমাংশু বলছেন, এক একটা গ্রামে ২০ থেকে ৩০ বার হামলা হয়েছে। এভাবে ৬৫০ টি গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইজরায়েল যেভাবে প্যালেস্টাইনে হত্যালীলা চালিয়েছে, ছত্তিসগড়ে বিজেপি সরকার একইভাবে হত্যালীলা চালায় প্রায় প্রতিদিন , মাওবাদী দমনের নামে।

ভারত সরকারের জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের রিপোর্টে দেখা গেছে, কী ভাবে ১৬ জন আদিবাসী মহিলার ওপর (তারমধ্যে নাবালিকাও ছিল) অত্যাচার করেছে ভারতীয় সেনা; নিপীড়িতাদের তাদের শরীরের এমন কোনো জায়গা বাকি নেই যেখানে সেনাবাহিনীর লোকেরা আঘাত করেনি । সোনি সোরির কথায়, সুধার ঘটনাটা দেখুন; ‘তাঁকে আধাসামরিক বাহিনী তাঁর নিজের ঘর থেকে তুলে নিয়ে যায়। গ্রামের অন্য মহিলারা কাঁদতে কাঁদতে তাঁদের অনুরোধ করেন; যদি অপরাধ করে থাকে তবে মামলা করুন, কিন্তু দয়া করে ওঁকে নিয়ে যাবেন না। কিন্তু তারা কিছুই শোনেনি।’ তাঁকে বাড়ির খুব কাছের জঙ্গলে টেনে নিয়ে গিয়ে, যতক্ষণ না তাঁর মৃত্যু হচ্ছে ততক্ষণ বারংবার ধর্ষণ করে যাওয়া হয়। একটা গুলিও ছোঁড়া হয়নি। যখন তাঁর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল, তখন বলা হল; একজন নকশালকে এনকাউন্টার করা হয়েছে। ওঁর দেহটি দান্তেওয়াড়ার হাসপাতালে আনা হয়। আমাকে বলা হল, তাঁকে গুলি করে মারা হয়েছে। আমি কর্তব্যরত চিকিৎসককে বললাম, দেহটা দেখতে চাই। দেখলাম, দেহের কোথাও একটাও গুলির চিহ্ন নেই। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তআপনারা বলছেন এটা এনকাউন্টার, তাহলে কোনও গুলির চিহ্ন নেই কেন ?’ উত্তর নেই।

আরও আছে, কোর্টে ধর্ষণের ফাইলে ধর্ষিতাদের নাম লেখা হয় না। লেখা হয় অভিযুক্ত বনাম রাষ্ট্র, রাষ্ট্রই অভিযুক্ত রাষ্ট্রই ভক্ষক। যাদের নিরাপত্তা দেওয়ার কথা ছিল তারাই ধর্ষক। হিমাংশু বলেছেন, আমার সাথী সোনি সোরির ওপর অকথ্য অত্যাচার চালায় ছত্তিসগড় পুলিশ।

সোনি সোরি। মানবাধিকার কর্মী। ছত্তিসগড়ের নিপিড়ীত আদিবাসীদের জন্য নিজের জীবন বাজি রেখে যিনি লড়াই করছেন।

সহযোদ্ধা সোনি সোরি। তাঁকে কোর্টে না নিয়ে সরাসরি জেলে ভরা হয়েছিল। সোনি সোরিকে পুলিশ তুলে নিয়ে গিয়ে তাঁর যৌনাঙ্গে পাথর ঢুকিয়ে দিয়েছিল। তাঁকে দু বছর বিনা বিচারে কারাবন্দী করে রাখা হয়। কারাগারের অভ্যন্তরে তিনি নানা ধরনের যৌন নির্যাতনের শিকার হন। সেই সময়ের জেলা পুলিশ কর্তা অঙ্কিত গর্গ তার ওপরে যৌন নির্যাতন চালিয়েছে বলে অভিযোগ। পরে এই অঙ্কিত গর্গ 'প্রেসিডেন্টস পুলিশ মেডেল ফর গ্যালান্ট্রি' পুরস্কার পায়।

হিমাংশু কুমার বলছেন, সোনি সোরি আমাকে চিঠিতে জানিয়েছেন, তিনি জেলের মধ্যে ভেবেছিলেন, আত্মহত্যা করবেন। তখন জেলবন্দী কিছু আদিবাসী মেয়ে এসে সোনিকে ব্লাউজ খুলে দেখিয়ে বলে, 'দিদি আমাদের অবস্থা দেখুন। পুলিশ আমাদেরকে যৌন নির্যাতনের পর স্তনবৃন্ত কেটে দিয়েছে। ইলেকট্রিক শকে যৌনাঙ্গ ঝলসে দিয়েছে। তবু আমরা প্রতিদিন বাঁচছি। আপনি লেখাপড়া করা শিক্ষিত দিদি। আপনি আত্মহত্যার কথা ভাববেন কেন?'

তাদের যৌনাঙ্গে ইলেক্ট্রিক শকের চিহ্ন আছে। নাবালিকা মেয়েদের ওপর পুরো পুলিশ স্টেশন দিনের পর দিন গণধর্ষণ চালিয়েছে। হিমাংশু কুমার যখন সোশ্যাল মিডিয়ায় চ্যালেঞ্জ করে এই লেখা পোস্ট করেন, তখন এক মহিলা জেলর তাঁর লেখার সত্যতা স্বীকার করে মন্তব্য করেছিলেন, 'আমি যখন বস্তারে ছিলাম, আমি এরকম মেয়েদের দেখেছি, আপনি ঠিক বলেছেন।' তার পরের দিন মাওবাদী তকমা দিয়ে সেই জেলরকে সাসপেন্ড করা হয়।

মজার কথা হল, মাওবাদী হবার অভিযোগ ইন্টারন্যাশনাল রেড ক্রশের উপরেও ছিল। দুনিয়ার যে কোনও জেলে ইন্টারন্যাশনাল রেড ক্রশ যেতে পারে , কিন্তু ভারতের ছত্তিসগড়ে জেলে তাদের প্রবেশাধিকার নেই। এমনকি নন্দিনী সুন্দরের কেসে সুপ্রিম কোর্টকে মাওবাদী বলে দেগে দিতেও ছত্তিসগড় সরকার ছাড়েনি। জাতিসংঘ থেকে বস্তারে আদিবাসীদের সঙ্গে দেখা করতে এলে বিজেপির মুখপাত্র বলে জাতিসংঘের সঙ্গে মাওবাদী যোগ আছে। যখন ছত্তিসগড় জ্বলছে, চারিদিকে হত্যালীলা হচ্ছে, তখন হত্যা মামলায় তদন্ত করতে কালেক্টর ঢুকতেই তার বুকে পিস্তল ঠেকানো হল। সুপ্রিম কোর্টের অর্ডারে যখন সিবিআই তদন্তে গেল, তখন সিবিআইয়ের ওপর আক্রমণ চালানো হল। সিআরপিএফ , সিবিআই কে বাঁচাতে এলে সিআরপিএফ এর ব্যারাকে ছত্তিসগড়ের পুলিশ বোমা ফেলে। ছত্তিসগড়ের সিকিউরিটি ফোর্স পুঁজিপতিদের খাস-পেয়াদা হিসেবে আজ্ঞা বহন করে।

আমি সুপ্রিম কোর্টে একটার পর একটা মামলা করেছি। এই মুহূর্তে ৫৭২ টি মামলা লড়ছি। আদিবাসীদের পক্ষ থেকে NALSA র মাধ্যমে। আদিবাসীরা যখন প্রথম মামলা শুরু করে বিজেপির প্রথম বুলডোজার এক্সপেরিমেন্ট আমাদের ওপর হয়েছে। বিন্দু বিন্দু রক্ত ঘাম দিয়ে তিল তিল করে তৈরি করা ১৮ বছরের পুরনো আশ্রম ১৮ মিনিটের মধ্যে মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হয়। তাদের বোঝানোর চেষ্টা করতাম, লোক আদালত কী, আইনি অধিকার কী। রাষ্ট্র তার প্রতিদানে দু হাজার ফৌজ নিয়ে এসে আমার আশ্রম বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। আজ আপনারা যে বুলডোজার রাজ দেখছেন তার সূচনা হয়েছিল ছত্রিশগড়ে আমার আশ্রম গুড়িয়ে দেওয়ার মধ্য দিয়ে।

হিমাংশু কুমার মাওবাদে বিশ্বাসী নন। আপাদমস্তক গান্ধীবাদী। হিমাংশুর বাবা বিনোবা ভাবের শিষ্য ছিলেন। খুব অল্প কিছুদিনের জন্য উত্তরপ্রদেশে ভূমি সংস্কার দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন। তিনি তাঁর বাবার মুখে শুনেছিলেন, মহাত্মা গান্ধীর বলা কথা 'যুবকদের গ্রামে গিয়ে কাজ করা উচিত। নাহলে গণতন্ত্র গুন্ডাতন্ত্রে পরিণত হবে।'

হিমাংশু বলছেন, আমি বিয়ের ২০ দিন পরেই দিল্লি থেকে নববধূকে নিয়ে ছত্তিশগড়ের দান্তেওয়াড়া গ্রামে একটা গাছের নীচে বাসা বেঁধে থাকতে শুরু করি। ধীরে ধীরে সেখানে একটি আশ্রম গড়ে তুলেছিলাম আমরা। আমরা আদিবাসীদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পঞ্চায়েতি রাজ, আইনি অধিকারের পাঠ শেখাতাম। সেই হিমাংশু কুমারের গান্ধীবাদী আশ্রম অশোক স্তম্ভ লাগানো ইউনিফর্ম পরে আমাদের রাষ্ট্রের পুলিশ গুঁড়িয়ে দিয়েছে।

সূর্য সেন ভবনের মঞ্চে সারি দেওয়া স্বাধীনতা সংগ্রামীদের দিকে তাকিয়ে হিমাংশু বলছেন, হয়তো এই শহীদেরা ভাবছেন এই স্বাধীনতার জন্যই কি আমরা ফাঁসির দড়ি বরণ করে নিয়েছিলাম?

হিমাংশু কুমার বলে চলেছেন, আপনারা ভাবছেন এই লড়াইটা মাওবাদীদের সঙ্গে, এই লড়াইটা শুধু বস্তারে। ভুল। এই লড়াইটা ক্রমশ বাড়বে। কর্পোরেটের আগামী লক্ষ্য গোটা কৃষির উপর দখল নেওয়া। সুতরাং বস্তারের আক্রমণটা কেবলমাত্র বস্তারে আটকে থাকবে না।

হিমাংশু কুমার গান্ধীবাদী হওয়া সত্ত্বেও মাওবাদীদের জমি বাঁচানোর নৈতিক লড়াইকে সমর্থন করেন। একদা এক সরকারি আধিকারিক তাঁকে বলেছিলেন, মাওবাদী মুক্ত মানেই সেখানে শান্তি আছে। তিনি বলেছিলেন, যদি কোনো এলাকায় ন্যায় না থাকে তাহলে সেখানে শান্তি থাকার প্রশ্ন কোথায়? আমরা শান্তির জন্য কাজ করছি না। আমাদের লড়াই ন্যায্যতার জন্য। যেখানে অন্যায় চলে এবং প্রতিবাদ না থাকে তাহলে সেটা শান্তি আছে মনে হতে পারে। কিন্তু সেটা আসলে শান্তি নয়। শাসকের চাপিয়ে দেওয়া নীরবতা।

সংযত গলায় হিমাংশু কুমার বলেন, রাষ্ট্র পঁচিশ হাজার সেনা নামিয়ে পাহাড় জঙ্গল ঘিরে ফেলার পরও যখন হিভমাকে ধরতে পারে না, তখন বুঝতে হবে রাষ্ট্র পরাজিত হচ্ছে। প্রতিরোধ জয়ী হচ্ছে।

কালবুর্গী, গোবিন্দ পানসারে, গৌরী লংকেশ, স্ট্যান স্বামী জেলের ভেতরে অথবা বাইরে খুন হয়ে যান। তবুও অকুতোভয় হিমাংশু কুমার, সোনি সোরিরা বস্তার থেকে কলকাতা মানুষের অধিকারের কথা বলে চলেন। কারণ লড়াইটা ন্যায্যতার জন্য। ভবিষ্যতের ফ্যাসিবাদকে রুখতে এরকম অনেক অনেক হিমাংশু কুমারদের প্রয়োজন আমাদের।

কেন্দ্রের জনবিরোধী স্মার্ট মিটার প্রকল্প রাজ্য বাতিল করুক

প্রসেনজিৎ দত্ত

বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থাকে সম্পূর্ণ বেসরকারিকরণের উদ্দেশ্যে আরও একটা পদক্ষেপ কেন্দ্রীয় সরকারের।নতুন একটি স্কিমের মধ্যে দিয়ে আম্বানি,আদানি, গোয়েঙ্কা, জিন্দাল ইত্যাদির হাতে বিদ্যুৎ বণ্টন ব্যবস্থাকে তুলে দিয়ে নতুন পথে হাঁটতে চাইছে দিল্লির সরকার। কেন্দ্রের সরকারের এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করার জন্য চূড়ান্ত তৎপরতা দেখিয়েছে আমাদের রাজ্যের সরকার। স্কিমটির মূল লক্ষ্য ' প্রি-পেইড স্মার্ট মিটার' বিদুৎ গ্রাহকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া। এই ব্যবস্থা কার্যকর হতে শুরু হতেই রাজ্যজুড়ে শুরু হয় প্রবল বিক্ষোভ। বিক্ষোভের আঁচ পৌঁছেছে রাজ্যের শাসকদলের অন্দরে। সামনে বিধানসভা নির্বাচনে এর প্রভাব যাতে না পরে, সেই লক্ষ্যে বিধানসভায় বিদ্যুৎ মন্ত্রীকে ঘোষণা করতে হয়েছে আপাতত স্মার্ট মিটার বসবে না গৃহস্থের বাড়ী। যে বাড়িতে স্মার্ট মিটার লাগানো হয়েছে সেটাও পোস্ট পেইড মিটার হিসাবেই কার্যকর করা হবে।

সাধারণ মানুষ দুই সরকারের এই পদক্ষেপ কে গ্রহণ না করে রাস্তায় নেমে বিরোধিতা করছে কেন, তা একটু বুঝে নেওয়ার দরকার। এখনকার ব্যবস্থা অনুযায়ী বিদ্যুৎ গ্রাহকরা আগে বিদ্যুৎ ব্যবহার করেন,তারপর মিটার রিডিং অনুযায়ী তিন মাসের বিল দেওয়া হয়। গ্রাহকরা বিল অনুযায়ী তিন মাসের টা একসঙ্গে,বা মাসে মাসে পরিশোধ করতে পারেন। সময়মতো বিল পরিশোধ করতে ব্যার্থ গ্রাহক নোটিশের মাধ্যমে বণ্টন সংস্থা থেকে ১৫ দিনের সময় পান,তারপরও যদি তিনি বিল বকেয়া রাখেন তাহলে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়।নতুন ব্যবস্থায় ফ্যালো কড়ি মাখো তেল,অর্থাৎ প্রিপেইড স্মার্ট মিটার গ্রহণ করলে আপনাকে আগে টাকা জমা করে বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে হবে। বিদ্যুতের ব্যবহার অনুযায়ী ইউনিট প্রতি নির্ধারিত মূল্যের সাপেক্ষে জমা টাকা খরচ হয়ে যেতেই বন্ধ হয়ে যাবে বিদ্যুতের যোগান।

আমরা এখন যে মিটারটি বাড়ীতে ব্যবহার করছি সেটা ডিজিটাল মিটার। এই মিটার কে বাইরে থেকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। কিন্তু স্মার্ট মিটার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যার ফলে বাইরে থেকেই এর অটোমেটিক কানেকশন, ডিসকানেকশন, বিলিং সবটাই করা যাবে। এই ব্যবস্থায় সকালে,বিকালে,রাত্রে ইউনিটের বিভিন্ন রকম মূল্য 'STOD SYSTEM', চাহিদা অনুযায়ী দাম নির্ধারণ 'DYNAMIC PRICING SYSTEM', চুক্তির বাইরে ব্যবহার হলে অটোমেটিক ফিক্সড চার্জ লাগু করা যাবে। যা সবটাই গ্রাহকদের স্বার্থ বিরোধী। এখনকার মতো গ্রাহকদের হাতে কোনো বিলের হার্ড কপি পৌঁছবে না,যাতে করে গ্রাহক ইউনিটের মূল্য,মিটার রেন্ট,ফিক্সড চার্জ কোনো কিছুই বিশদে জানতে পারবে না।এই নতুন ব্যবস্থায় গ্রাহকদের নিরাপত্তা নিয়েও নানা প্রশ্ন আছে। লিংক না থাকা,মিটার হ্যাক হয়ে যাওয়া,নেটওয়ার্ক ফেলিওর ইত্যাদি সমস্যা যে কোনো সময় দেখা দিতে পারে। এই মিটার খারাপ হয়ে গেলে নতুন মিটার প্রয়োজন হলে ৭/৮ হাজার টাকা ব্যয়ে গ্রাহককেই সেই ব্যবস্থা করতে হবে। চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধির অর্থ বাড়তি বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের জন্য কম বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী অর্থাৎ গরীব মানুষের ঘাড়ে বড়লোকের দায় চাপবে।

কেন্দ্রীয় সরকারের এই রিভ্যাম্পড ডিস্ট্রিবিউশন সেক্টর স্কিম অনুযায়ী সমস্ত রাজ্যকেই এই প্রিপেইড স্মার্ট মিটার লাগানোর কথা বলা হয়েছে। এখন পর্যন্ত সাত আটটি রাজ্য এই কাজে নেমেছে। দুই একটি রাজ্যে আংশিক ভাবে এই কাজে অগ্রসর হয়েছে।আমাদের রাজ্য কেন্দ্রীয় সরকারের বানানো এই প্রকল্প কে মানানোর জন্য উঠে পড়ে নেমেও শেষ পর্যন্ত পিছু হটেছে। নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে যখন বিজেপি ও তৃণমূল বিভিন্ন কোম্পানির কাছ থেকে অতীতে কয়েকশো কোটি টাকা নিজেদের নির্বাচনী তহবিলে নিয়েছে,তার মধ্যে বিদ্যুৎ ব্যবসায় যুক্ত কোম্পানীরাও আছে।তাদের কে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার জন্যই এই ব্যবস্থার প্রবর্তন কি না সেই প্রশ্ন আজ উঠে এসেছে।

আমাদের রাজ্যের অনেকগুলি জেলায় এই কাজ শুরু হয়েছে। শিল্প ও বানিজ্য ক্ষেত্রে এই স্কিম কার্যকরী করার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। ডোমেস্টিক কানেকশনের ক্ষেত্রে ধাপে ধাপে কার্যকর করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। যে সমস্ত এলাকায় এই মিটার লাগানো হয়েছে,তাদের ক্ষেত্রে প্রিপেইড - এর পরিবর্তে পোস্ট পেইড হিসাবে স্মার্ট মিটার কে কার্যকর করা হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

যদিও ইতিমধ্যে প্রিপেইড স্মার্ট মিটার নেওয়া গ্রাহকরা অনেকেই নতুন বিধির কবলে পড়ে আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন।সেই কারনেই সেখানকার মানুষ দলমত নির্বিশেষে রাস্তায় নেমে এই ব্যবস্থা বাতিলের দাবিতে পথে নেমেছেন। রাজ্য সরকারের ঘোষণায় গৃহস্থ গ্রাহকেরা আপাতত ছাড় পেলেও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী থেকে কুটির শিল্পে যুক্ত মানুষ তাদের ছাড়ের কথা কিছু বলা হয় নি।এই ব্যবস্থায় মিটার রিডিং নেওয়ার ব্যবস্থা না থাকার কারনে এই কাজে যারা এতদিন যুক্ত ছিলেন,তারা কর্মচ্যুত হবেন।সুতরাং সবদিক থেকেই এই নতুন ব্যবস্থা সাধারণ মানুষের স্বার্থের পরিপন্থী।

সর্বশেষ যে বিষয়টি সমস্ত মানুষের জেনে রাখা দরকার তা হলো সর্বশেষ যে বিদ্যুৎ আইন ২০০৩, সেই আইনের বলেই আপনি স্মার্ট মিটার নিতে বাধ্য নয়। আপনার অনুমতি ছাড়া সরকার বা কোনো সংস্থা জোরপূর্বক আপনার বাড়ীতে স্মার্ট মিটার লাগাতে পারবে না।

রাজ্য সরকার বর্তমানে ডোমেস্টিক কানেকশনের ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থাকে স্থগিত ঘোষণা করেছে,বাতিল করেনি। এই ব্যবস্থা বাতিল করার লক্ষ্যে তীব্র আন্দোলন, আজ সময়ের ডাক। এই কাজ কেবলমাত্র একজন গ্রাহকের নয়। দলমত নির্বিশেষে রাস্তায় নেমে সকলের প্রতিরোধ গড়ে তোলার মধ্য দিয়েই রোখা যাবে এই জনবিরোধী কার্যক্রম।

সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা অন্তিম যাত্রার অপেক্ষায়

মজিবুর রহমান

পশ্চিমবঙ্গের সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার দুরবস্থা সম্পর্কে সবিস্তার আলোচনা অনেকের কাছেই চর্বিত চর্বণ মনে হতে পারে। কিন্তু বিরক্ত হয়ে সাধারণের শিক্ষার বেহাল দশা নিয়ে কথা বলা বন্ধ করে দিলে তো মুশকিল ! সেক্ষেত্রে নাগরিক কর্তব্য পালনে বিচ্যুতি ঘটে। সর্বজনীন শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করার যেকোনো অপচেষ্টার বিরুদ্ধে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সকল মানুষকে রুখে দাঁড়াতে হবে। সর্বসাধারণের শিক্ষাকে গুরুত্বহীন করে তোলার সরকারি ষড়যন্ত্রের স্বরূপ সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে হবে। সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থাকে মৃত্যুশয্যায় পাঠিয়ে শিক্ষার বেসরকারিকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণ ঘটিয়ে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর পশ্চাৎপদতার নিশ্চিতকরণের অভিসন্ধিকে সফল হতে দেওয়া যায় না।

শিক্ষার প্রতি সরকার বা শাসকদলের মনোভাব সম্পর্কে রুশ মনীষী লিও টলস্টয় (১৮২৮-১৯১০) বলেছেন, ‘‘জনগণের অজ্ঞতার মধ্যে সরকারের শক্তি (স্ট্রেন্থ) নিহিত। সরকার তা জানে এবং সেজন্য সবসময়ই সত্যিকারের জ্ঞানচর্চার বিরোধিতা করে।’’ বিশ্ববন্দিত বাঙালি চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের (১৯২১-১৯৯২) ‘হীরক রাজার দেশে’ ছায়াছবিতে রাজার নির্দেশে উদয়ন পণ্ডিতের পাঠশালা বন্ধ করে দেওয়া হয়। কারণ, রাজার আশঙ্কা ছিল- ‘এরা (প্রজারা) যত বেশি পড়ে তত বেশি জানে তত কম মানে।’ হীরক রাজার উপলব্ধি আসলে সেই জনপ্রিয় উক্তির দ্যোতনা বহন করে যাতে বলা হয়- ‘শিক্ষা আনে চেতনা, চেতনা আনে বিপ্লব।’ শিক্ষা যেহেতু একটি সামাজিক অথবা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ব্যাপক বদল ঘটাতে সক্ষম সেহেতু কায়েমি স্বার্থের ধ্বজাধারীরা গণশিক্ষার প্রসারে আতঙ্ক অনুভব করে।

শাসকদল ভেদে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টায়। পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার (১৯৭৭-২০১১) জনশিক্ষার প্রসারে ইতিবাচক মনোভাব প্রদর্শন করে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর পরিবারগুলিতে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়ার আন্তরিক প্রয়াস গ্রহণ করা হয়।অনেক নতুন স্কুল কলেজ স্থাপন করা হয়। বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করা হয় জ্জ শিশু শিক্ষা কেন্দ্র ও মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্র গড়ে তোলা হয় । উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা প্রবর্তন করা হয়। এতে শিক্ষাঙ্গনে প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের ভিড় বাড়ে। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়। প্রতিটি থানায় কলেজ পড়ুয়াদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষার্থী বৃদ্ধির সঙ্গে সাযুজ্য রেখে নিয়মিত শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগ করা হয়। নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বজন পোষণ বন্ধ করতে তথা স্বচ্ছতা আনতে স্কুল সার্ভিস কমিশন প্রবর্তন করা হয়। ১৯৯৯ সাল থেকে ২০১০ সালের মধ্যে হতদরিদ্র পরিবারের হাজার হাজার ছেলেমেয়ে শুধুমাত্র মেধার ভিত্তিতে মাস্টারমশাই ও দিদিমণি নিযুক্ত হন। সুষ্ঠু ও দুর্নীতিমুক্ত নিয়োগ প্রক্রিয়া পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি ইতিবাচক দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

২০১১ সালে রাজ্যে রাজনৈতিক পালা বদলের পর শিক্ষাক্ষেত্রের সর্বত্র নেতিবাচক পরিবর্তন সূচিত হয়। স্কুল, মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙে দেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বশাসনের ওপর সরকার অযাচিত ভাবে হস্তক্ষেপ করতে থাকে। এখন অধিকাংশ ইউনিভার্সিটিতে স্থায়ী উপাচার্য নেই। কলেজের অধ্যক্ষরা শারীরিকভাবে নিগৃহীত হচ্ছেন। কলেজ সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে অধ্যাপক নিয়োগ কার্যত বন্ধ হয়ে গেছে। কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে ছাত্র ভর্তিও কমে গেছে। অন্তত এক-চতুর্থাংশ আসন ফাঁকাই পড়ে থাকছে। ক্লাস হচ্ছে না। এডুকেশন বাদ দিয়ে এডমিশান, রেজিস্ট্রেশন ও এগজামিনেশন চালিয়ে চাওয়া হচ্ছে। উচ্চশিক্ষার এমন বেহাল দশা পশ্চিমবঙ্গে আগে কখনও দেখা যায়নি।

সরকার প্রথাগত ও প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনার গুরুত্ব ভুলিয়ে দিতে চাইছে। এজন্য কারণে অকারণে স্কুল কলেজ ছুটি দেওয়া হচ্ছে। ছুটি দিতে সরকারের এমন ছটফটানি রাজ্যবাসী আগে কখনও দেখেনি। গত কয়েক বছরে বন্ধ কারখানা খোলার মতো স্কুল খোলার দাবিতে বিভিন্ন ছাত্র ও শিক্ষক সংগঠনকে একাধিকবার পথে নামতে দেখা গেছে।

জনসংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন স্কুল খোলার কথা। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার গতি পশ্চাৎমুখী হতে দেখা যাচ্ছে। শিক্ষার্থীর স্বল্পতার কারণে গত দুই-তিন বছরে আট হাজারের বেশি সরকারি বিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। বিভিন্ন ক্লাসের শিক্ষার্থী ও পরীক্ষার্থীদের মধ্যে বালকের সংখ্যা কমছে কারণ তারা বিভিন্ন কায়িক শ্রমের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়াশোনা ছেড়ে দিচ্ছে। সরকারি চাকরিতে নিয়োগ নেই তাই তারা বেশি লেখাপড়া না শিখে অপরিণত বয়সেই সস্তার শ্রমিক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করে দিচ্ছে। এর ফলে বাংলায় একটি অশিক্ষিত যুব সমাজ তৈরি হচ্ছে। এতদিন অনেক গ্র্যাজুয়েট স্বামীর নন-ম্যাট্রিক বৌ থাকত। এখন উল্টোটা হচ্ছে।

স্কুলের ছেলেমেয়েদের বই, খাতা, ব্যাগ, জুতা, সাইকেল, মিড ডে মিল, আয়রন ট্যাবলেট, ট্যাব, কন্যাশ্রী, শিক্ষাশ্রী, ঐক্যশ্রী, মেধাশ্রী সবকিছুই দেওয়া হচ্ছে। স্কুলে স্মার্ট ক্লাসরুম থাকছে। কিন্তু পাঠশালায় পড়াশোনার পরিবেশটা নষ্ট হয়ে গেছে। তাই এতকিছু পাওয়ার সুযোগ থাকলেও বিদ্যা ও বিত্ত থাকা পরিবারের সন্তানরা সরাসরি সরকারি বিদ্যালয়ে ভর্তি হচ্ছে না। সরকারি স্কুলের ওপর শিক্ষক সহ সরকারি চাকরীজীবীদেরই কোনো ভরসা নেই। তাঁরা সন্তানদের ব্যারিস্টার বানাতে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করছেন! সেখানেই তারা লেখাপড়া করছে। কিন্তু বোর্ড বা কাউন্সিলের পরীক্ষা দেওয়ার জন্য খাতা কলমে সরকারি স্কুলের সঙ্গে সংযুক্ত থাকছে। অনেকটা পি পি পি মডেলে চলছে। এতে সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার

শ্মশান যাত্রার পথ সুগম হচ্ছে। সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থাকে রক্ষা করতে অথবা ব্যয়বহুল বেসরকারি ব্যবস্থাকে আটকাতে আমাদের সমাজ সরকারের কোষাগার থেকে মাইনে পাওয়া মানুষদের আরও বেশি দায়িত্ববোধ ও দূরদর্শিতা দাবি করে।

সরকারি স্কুলের লেখাপড়ার মান কহতব্য নয়। ভালোভাবে নাম-ঠিকানা লিখতে বা গুণ-ভাগ করতে না শিখেও শিক্ষার্থীরা মাধ্যমিক পাশ করে যাচ্ছে। বেশ কিছু ছেলেমেয়ে পড়াশোনা নয়, প্রকল্পের সুবিধা ভোগ করতেই স্কুলে আসে। একইভাবে শিক্ষকদের একাংশ শিক্ষকতাকে বৃত্তি হিসেবেই দেখেন, ব্রত হিসেবে গ্রহণ করতে ব্যর্থ হন। সরকারি শিক্ষাঙ্গনে শিখতে উৎসুক শিক্ষার্থী আর শেখাতে আগ্রহী শিক্ষক দুটোরই সংখ্যা ক্রমশ কমছে।

বামফ্রন্ট সরকারের শেষ এক যুগ প্রতি বছর স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকারের এই সাফল্য তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের চূড়ান্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। টি এম সি সরকার গঠনের হ্যাটট্রিক করেছে কিন্তু নিয়োগ প্রক্রিয়া পরিচালনার হ্যাটট্রিক করতে পারেনি। শিক্ষামন্ত্রী বলেছিলেন, এস এস সি দুর্গা পূজা নাকি যে প্রতি বছর আয়োজন করতে হবে? এই সরকারের আমলে প্রাইমারি ও হাইস্কুলে যা নিয়োগ হয়েছিল সেগুলোর অধিকাংশই এখন বাতিল হয়ে যাচ্ছে। এর প্রধান কারণ শাসকদল ও সরকারের শীর্ষ ব্যক্তিদের প্রত্যক্ষ মদতে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সীমাহীন দুর্নীতি ।

কলকাতা উচ্চ আদালতের হস্তক্ষেপে ২০১৬ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বহুমাত্রিক অনিয়ম আবিষ্কার করা হয়। এই অনিয়ম আসলে একটি বড়সড় প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি। দুর্নীতির সঙ্গে কোটি কোটি টাকার লেনদেন জড়িয়ে রয়েছে। দুর্নীতিতে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকার অভিযোগে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী সহ শিক্ষা বিভাগের বহু সংখ্যক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা কারাদণ্ড ভোগ করছেন। সমগ্র নিয়োগ প্রক্রিয়া সাঙ্ঘাতিকভাবে দুর্নীতিমূলক হলেও দেখা যায়, চাকরিজীবীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ সচেতনভাবে কোনো দুর্নীতির আশ্রয় নেননি। তাঁরা তাঁদের অজান্তেই দুর্নীতিমূলক প্রক্রিয়ার অংশ হয়ে গেছেন মাত্র। এতে তাঁদের কোনো দায় নেই। সুতরাং, সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে তাঁদের চাকরিতে বহাল থাকা উচিত। যাঁরা জেনেবুঝে দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে চাকরিতে নিযুক্ত হয়েছেন তাঁদের বরখাস্ত করা দরকার। এরূপ ভাবনা থেকেই বিচার প্রক্রিয়া চলাকালীন বিচারপতিরা 'টেন্টেড' ও 'আনটেন্টেড'দের দুটি পৃথক তালিকা পেতে চেয়েছেন। এই পৃথকীকরণের কাজটি সরকার পক্ষের করার কথা। কিন্তু তারা তা কোনোভাবেই করতে চায়নি।

ফলত, প্রথমে উচ্চ আদালতের বিশেষ বেঞ্চ এবং পরে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ পুরো প্যানেল বাতিল করে দিয়েছে। সেই সঙ্গে ২০১৬ সালের বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষিত শূন্যপদ পূরণের লক্ষ্যে কিছু শর্ত সাপেক্ষে নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করার নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, ৩০শে মে, ২০২৫ সরকার যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে তাতে সুপ্রিম কোর্টের শর্তাবলী গুরুতরভাবে লঙ্ঘন করা হয়েছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ বিচারব্যবস্থা। সুপ্রিম কোর্ট সেই বিচারব্যবস্থার সর্বোচ্চে অবস্থান করে। তার রায় পছন্দ হোক অপছন্দ হোক, নরম হোক কড়া হোক তা কার্যকর করাই বিধেয়। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ পালনে টালবাহানা করা কোনো সভ্য সমাজে শোভা পায় না। আশ্চর্যজনকভাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই অশোভনীয় কাজটিই করে চলেছে।

আর একটি মারাত্মক ও অতীব দুঃখজনক ঘটনার কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন জ্জ গত ১৫ /২০ বছর ধরে যে সকল ছাত্র ছাত্রী অনার্স নিয়ে গ্র্যাজুয়েট হয়েছেন, তারপর মাস্টার ডিগ্রি করেছেন , অনেকে আবার B.Ed পাস করেছেন তাঁদের Employment é-এর অন্যতম বড় সুযোগ ছিল Secondary বা এমনকি Primary স্কুলে জ্জ সব পথ বন্ধ। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার, যারা ছিল দেশের বৃহত্তম Employer , তাঁরা সমস্ত Recruitment বন্ধ করে রেখেছেন । ভয়ঙ্কর ও ভয়াবহ শিক্ষিত বেকার সমস্যা ।

আসলে সরকারের নিয়োগ করার ইচ্ছাই নেই। মেলা-খেলা, উৎসব আর অনুদানের খরচ যোগাতে রাজকোষের ভাঁড়ে মা ভবানীর অবস্থা। সেজন্য সরকার পূর্ণ বেতন কাঠামোর শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগ করার ব্যাপারে অনাগ্রহী। তাছাড়া কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার তাদের আর্থিক দায়ভার কমাতে শিক্ষাক্ষেত্রকে বেশি বেশি করে বেসরকারি হাতে সঁপে দেওয়ার নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাই ইচ্ছাকৃতভাবে বিজ্ঞপ্তি সহ নিয়োগ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়কে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ত্রুটিপূর্ণ করা হচ্ছে যাতে তা আদালতে চ্যালেঞ্জ করা হয় এবং নিয়োগ আটকে যায়। সরকারের এই মতলব সম্পর্কে চাকরিচ্যুত ও চাকরিপ্রার্থী সকলকেই সচেতন হতে হবে।

বুঝতে হবে যে, বিকাশ রঞ্জন নন, বিকাশ ভবন প্যানেল বাতিল ও নিয়োগ প্রক্রিয়ার অনিশ্চয়তার জন্য দায়ী। সরকারকে বাধ্য করতে হবে ত্রুটিহীন ও দুর্নীতিমুক্ত নিয়োগ প্রক্রিয়া পরিচালনা করতে। তা না হলে সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থাকে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্র (আই সি ইউ) থেকে বের করা সম্ভব হবে না।

(লেখক মুর্শিদাবাদ জেলার কাবিলপুর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক)

প্রযুক্তির বিস্ময় চেনাব নদীর ব্রিজ কৃতিত্ব কার ? মোদীর ?

শুভাশিস মজুমদার

নতুন ট্রেন চালু করা থেকে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, নতুন সেতু বা সুড়ঙ্গ পথ নির্মাণ থেকে রাম মন্দির নির্মাণ-সব কিছুর কৃতিত্বের দাবিদার তিনি একা। তাই নতুন নির্মাণের উদ্ঘাটনের ফটো ফ্রেমে তাঁর আশেপাশে অন্য কাউকে দেখা যায় না। কোন আধিকারিক বা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী, কেউ না। তিনি

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মনে পড়ে ১৯৫৯ সালের ৬ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু এসেছিলেন।D.V.C-র পানচেত ব্যারেজ ও ড্যাম উদ্বোধন করতে। কিন্তু তিনি বললেন এই উদ্বোধন করা উচিত একজন প্রান্তিক মানুষের। প্রধানমন্ত্রীকে D.V.C-র পক্ষে বুধনি মেঝেন নামে এক সাঁওতাল কিশোরী মাল্য অর্পণ করে স্বাগত জানান। পণ্ডিত নেহরু তাঁকে দিয়েই ওই বাঁধ ও জলাধার উদ্বোধন করান। এই ছিল আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের শিক্ষা। নরেন্দ্র মোদী এই শিক্ষা তো পাননি।

সম্প্রতি কাশ্মীরের চেনাব নদীর উপর বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু রেলওয়ে আর্চ ব্রিজের উদ্বোধন করলেন মোদী। জাতীয় পতাকা দোলাতে দোলাতে ফটোশুট করলেন ব্রিজের উপর। তাঁর আশেপাশে অন্য কাউকে দেখা গেল না। অনেকটা দূরে দাঁড়িয়ে নিরাপত্তা রক্ষীরা। এই নির্মাণের কৃতিত্ব অন্য কাউকে দিতে রাজী নন্ তিনি, ঠিক যেমনটি ছিল অটল সুড়ঙ্গ উদঘাটনের সময়। ভাব খানা এমন যেন প্রকল্পের শুরু থেকে শেষ সবই তিনি করেছেন।

কিন্তু চেনাব ব্রিজ নির্মাণের ইতিহাস অন্য কথা বলে।

২০০৯ সালে ডঃ মনমোহন সিংয়ের নেতৃত্বাধীন ইউ পি এ সরকার ভারতীয় রেলওয়ের জন্য ভিশন-২০২০ নথি সংসদে উপস্থাপন করেছিলেন। ২০০৯ সালের রেল বাজেটের নথির একটি অংশ যা তৎকালীন রেলমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সংসদে পাঠ করেছিলেন, তাতে বলা হয়েছে 'ম্যাডাম (স্পিকার), অনন্তনাগ থেকে কাশ্মীর উপত্যকার বারামুল্লা পর্যন্ত নতুন রেল লাইন ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। তাছাড়া, কাজীগুন্ড-অনন্তনাগ লাইনটি ২০০৯ সালের আগস্টের মধ্যে সম্পন্ন হবে এবং শীঘ্রই উদ্বোধন করা হবে। উধমপুর-কাটরা এবং কাটরা-কাজীগুন্ড পর্যন্ত লাইনের কিছু অংশে সমস্যার সম্মুখীন হওয়ায় জম্মু ও কাশ্মীর প্রকল্পের কাজ কিছুটা পিছিয়ে গেছে।'

'কাটরা-কাজীগুন্ডঅংশের অ্যালাইনমেন্টের কাজ পর্যালোচনাধীন রয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি অধ্যয়নের জন্য নিযুক্ত একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি সম্প্রতি তাদের রিপোর্ট জমা দিয়েছে।'

ইউ পি এ সরকারের রেলমন্ত্রী সংসদে আরো বলেন, যাত্রীদের নিরাপত্তার কথা স্মরণে রেখে এই প্রকল্পের সিদ্ধান্ত খুব সাবধানতার সাথে নিতে হবে। শীঘ্রই বিষয়টি পর্যালোচনা করা হবে এবং জাতীয় প্রকল্পের এই অংশটি কত দ্রুত সম্পন্ন করা যেতে পারে তা দেখা হবে।

২০০৯ সালের রেল বাজেটে, ডঃ মনমোহন সিংয়ের ইউ পি এ সরকার উধমপুর-শ্রীনগর-বারামুল্লা সেকশনের জন্য অতিরিক্ত ১,৯৪৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিলেন।

সম্প্রতি মোদী যে চেনাব ব্রিজে জাতীয় পতাকা হাতে ধরে সেতু উদ্বোধন করলেন, সেটিকে ২০১০ সালে রেল বাজেটে ইউ পি এ সরকার নতুন লাইন প্রকল্প হিসেবে ঘোষণা করেছিল। রিয়াসি জেলার কৌরি এবং বাক্কালের মধ্যে অবস্থিত, সেতুটি উধমপুর-শ্রীনগর-বারামুল্লা রেল লিঙ্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ তৈরি করেছে।

এই ব্রিজ উদ্বোধন কালে নরেন্দ্র মোদী, এই নির্মাণ কাজের সঙ্গে যুক্ত, তাঁর সরকারের পূর্ববর্তী সময়ের কঠোর পরিশ্রম করা সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রযুক্তিবিদ, শ্রমিক- কর্মচারী, পূর্ববর্তী প্রধানমন্ত্রীগণ পি.ভি. নরসিংহ রাও, অটল বিহারী বাজপেয়ী এবং ইউপিএ সরকারের প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং বা তৎকালীন রেলমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-যাঁরা প্রকৃতপক্ষে প্রকল্পটির অনুমোদন এবং ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন - সৌজন্যবশত তাঁদের কথা উল্লেখই করলেন না। যা মোদীকে আত্মকেন্দ্রিক ও আত্ম-প্রচারকারী হিসাবেই তুলে ধরে।

তৃণমূলের সাংসদ সাগরিকা ঘোষ বলেছেন,'এই ধরণের ঈর্ষান্বিত হয়ে কৃতিত্ব আত্মসাৎ ভারতে নজিরবিহীন ও অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।' সাগরিকা ঘোষ এই প্রকল্পের সাথে সম্পর্কিত পুরোনো একটি ছবি শেয়ার করেছেন যাতে মঞ্চে তৎকালীন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত ডঃ মনমোহন সিং এর সঙ্গে রেলমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি, ইউপিএ চেয়ারপারসন সোনিয়া গান্ধি, ফারুক আবদুল্লাহ এবং বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী ওমর আধুল্লাহকে দেখা যাচ্ছে।ইউপিএ-১ এর প্রথম বছরে ১৩ এপ্রিল, ২০০৫ তারিখে ডঃ মনমোহন সিং জম্মু ও উধমপুরের মধ্যে ৫৩ কিলোমিটার রেল সংযোগ উদ্বোধন করেছিলেন। ১১ অক্টোবর, ২০০৮ তারিখে, শ্রীনগরের বাইরে অনন্তনাগ এবং মাঝহোমের মধ্যে আরও ৬৬ কিলোমিটার রেল সংযোগ উদ্বোধন করেছিলেন ডঃ সিং।

তৃতীয় পর্যায়ে ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০০৯ তারিখে মাঝহোম এবং বারামুল্লার মধ্যে ৩১ কিলোমিটার রেল সংযোগ উদ্বোধন করা হয়েছিল। অনন্তনাগ এবং কাজিগুন্ডের মধ্যে ১৮ কিলোমিটার রেল সংযোগ উদ্বোধন করা হয়েছিল ২৯ অক্টোবর, ২০০৯ তারিখে যেখানে তৎকালীন রেলমন্ত্রী মমতা উপস্থিত ছিলেন।

কাজিগুন্ড থেকে বানিহালের মধ্যে রেল সংযোগ উদ্বোধন করেছিলেন ড সিং ২৬ জুন, ২০১৩ তারিখে। এটাই ছিল দুই মেয়াদের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ডঃ মনমোহন সিংয়ের শেষ বছর।

কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশও মোদীকে এই প্রকল্পে তাঁর পূর্বসূরীদের অবদানের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

রমেশ বলেছেন,ত্এই রেল প্রকল্পটি ১৯৯৫ সালে অনুমোদন করা হয়েছিল যখন নরসিংহ রাও প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ২০০২ সালে অটল বিহারী বাজপেয়ী এটিকে জাতীয় প্রকল্প হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন। তিনি আরো বলেন,'উধমপুর, শ্রীনগর এবং বারামুল্লার মধ্যে ২৭২ কিলোমিটারের রেলপথটির, ১৬০ কিলোমিটার অংশ ২০১৪ সালের আগেই উদ্বোধন করা হয়েছিল। এমন নয় যে মোদী এলেন, চুক্তি করলেন এবং তারপর কাজ শুরু হয়েছিল।'

এই প্রকল্প যে পূর্ববর্তী সরকারের আমল থেকে শুরু করে ধারাবাহিক কাজের ফসল, তাই নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

ডঃ মনমোহন সিং সরকারের সময়ে এই প্রকল্পের সাথে সম্পর্কিত দুটি শিল্প প্রকল্প স্থাপন করা হয় - জম্মু ও কাশ্মীরে একটি সেতু কারখানা এবং জম্মুতে ইনস্টিটিউট অফ টানেল অ্যান্ড ব্রিজ ইঞ্জিনিয়ারিং।

সাগরিকা ঘোষ বলেছেন,'ভারতের অগ্রগতির পথ ২০১৪ সালে শুরু হয়নি। হেডলাইন ম্যানেজমেন্ট আর বাস্তব এক নয়। কেউ কেউ আত্ম-প্রচার ছাড়াই চুপচাপ কাজ করেন, অন্যরা (আত্ম- প্রচারের উদ্দেশ্যে) দ্রুত ছবি তোলার চেষ্টা করেন।'

অধ্যাপক জি মাধবী লথা ও তাঁর সহকর্মীরা

চেনাব নদীর উপর বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু রেলওয়ে আর্চ ব্রিজ নির্মাণে আলোড়ন ফেলে দেওয়া অধ্যাপক জি. মাধবী লথা বলেছেন, এই প্রকল্পের গৌরব ভারতীয় রেল এবং 'হাজার হাজার অখ্যাত বীরদের', যারা পর্দার আড়ালে কাজ করে এই প্রকৌশলগত কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। ১৭ বছর ধরে ড. লথা ও তাঁর সহকর্মীরা ঢাল (স্লোপ) স্থিতিশীলকরণ প্রক্রিয়া এবং এই চ্যালেঞ্জিং ভূখণ্ডের ভিত্তি নকশা তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। চেনাব বা চন্দ্রভাগা নদের উপর নির্মিত এই ব্রিজ আইফেল টাওয়ার - এর থেকে ৩৫ মিটার উঁচু জ্জ ১৩১৫ মিটার দীর্ঘ ব্রিজটি সম্পূর্ণ স্টিল দিয়ে নির্মিত ও চেনাব নদী থেকে ৩৫৯ মিটার উচ্চতায় নির্মিত। চেনাব ব্রিজ ২৭২ কি.মি দীর্ঘ উধমপুর- শ্রীনগর - বারামূলা লাইনের অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ , যে পথে রয়েছে আরো ৯৪৩ টি ব্রিজ ও ৩৬ টি টানেল।এই ব্রিজ ও সমগ্র পরিকল্পনা ড. মাধবী লথা ও তাঁর সহ - কর্মীরা রচনা করেন ।২০০৫ সালে তিনি এই কাজ শুরু করেন।নদীর গতি পথে পাহাড়ের ঢাল ও ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট বুঝবার জন্য তিনি সহকর্মীদের নিয়ে বারবার খরস্রোতা চেনাব নদীতে নৌকো করে ঘুরেছেন ।পাহাড়ে Treck করেছেন । তিনি সাংবাদিকদের বলেন এই পাহাড় ও নদীর গোপন রহস্য আমাদের অনুধাবন করতে হয়েছে। ব্রিজ নির্মাণে ২৮,৬৬০ টন স্টিল ও ৬৬,০০০ কিউবিক মিটার কংক্রিট লেগেছে । ২৬.কি. মি দীর্ঘ ভারী যন্ত্রপাতি বহনে সক্ষম রাস্তা বানাতে হয়েছে ।এই ব্রিজের ওপর দিয়ে ঘন্টায় ১০০ কি.মি গতিতে ট্রেন চলতে পারবে জ্জ এর ৮ টি স্তম্ভের ১ টি যদি ভেঙেও যায় তাও ট্রেন ৩০ কি.মি গতিতে চলবে । প্রবল ভূমিকম্পেও এই ব্রিজের কোনও ক্ষতি হবে না ।

ডঃ জি মাধবী লথা এন.আই.টি, ওয়ারনগল থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে আই.আই.টি মাদ্রাজ থেকে পিএইচডি করেন। বর্তমানে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স (আই আই এস সি) এর অধ্যাপক। এই প্রতিষ্ঠান স্বাধীন ভারতে বিজ্ঞান, প্রকৌশল, নকশা এবং ম্যানেজমেন্ট উচ্চশিক্ষা এবং গবেষণার জন্য একটি পাবলিক, ডিমড বিশ্ববিদ্যালয়। এটি কর্ণাটকের বেঙ্গালুরুতে অবস্থিত। জামশেদজি টাটার সক্রিয় সহায়তায় ১৯০৯ সালে এই ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং তাই স্থানীয়ভাবে এটি টাটা ইনস্টিটিউট নামেও পরিচিত। এটি ১৯৫৮ সালে, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর আমলে একটি ডিমড বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা লাভ করে। দূরদর্শী পণ্ডিত নেহরু প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ভারতে বিজ্ঞান ও প্রকৌশল প্রযুক্তির গবেষণা ও উন্নতি জন্য যে সমস্ত বৃহৎ প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছিলেন তার সুফল আজ ভারতবাসী পাচ্ছে।

কার্ল মার্কসের ধর্মচিন্তা

সোমেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

(সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও নির্মাল্য আচার্য সম্পাদিত 'এক্ষণ' পত্রিকার ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত 'কার্ল মার্কস বিশেষ সংখ্যা'য় লেখাটি প্রকাশিত হয়।তিন পর্বে সমাপ্য দীর্ঘ লেখাটির এবার দ্বিতীয় পর্ব)

২.

মানবসমাজের ক্রমবিবর্তন যতটা অগ্রসর হয়েছে তা থেকে দেখা যায় যে, উৎপাদন পদ্ধতির সঙ্গে তাল রেখেই বিভিন্ন যুগের বিকাশ হয়েছে। শ্রেণী পূর্ব বা আদি সাম্যবাদী সমাজে উৎপাদনের মান এত নিচে ছিল যে সর্বনিম্ন জীবিকা নির্বাহের পরিমাণ বজায় রাখতে হলে সমাজের সামগ্রিক প্রচেষ্টার প্রয়োজন হতো। তখন কারও কারও নিজের বিশেষ গুণের দ্বারা অর্জিত বেশি সম্মান ছাড়া কোনো রকম আর্থিক বা সামাজিক অসমতা ছিল না। যেহেতু সমাজে উদ্বৃত্ত উৎপাদন বলে কিছু থাকত না, একজনের শ্রমের উপর আর একজন বসে খেতে পারত না। উৎপাদন পদ্ধতি যখন উন্নত হল, এবং যার ফলে সমাজের আশু প্রয়োজন মিটিয়েও কিছু উদ্বৃত্ত হতে শুরু করল, তখন এক-এক গোষ্ঠীর লোকেরা এক-একটি শিল্পে দক্ষ হয়ে উঠল। তাদের আহার জোগাতে লাগল সমাজের বাকি লোকেরা। এইভাবে শ্রমবিভাগ শুরু হল, যার ফলে উৎপাদন কৌশলে আরও উন্নতি হতে লাগল এবং পরিশেষে গুণগতভাবে নতুন এক শ্রমবিভাগের উৎপত্তি হল; উৎপাদনকারী এবং উৎপাদন সংগঠনকারী। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা হলেন প্রধান বা পুরোহিত, যাঁরা কৃষির উন্নতির জন্য যে অঙ্কবিদ্যা ও জ্যোতির্বিদ্যার প্রয়োজন হতো তার অধিকারী। কালক্রমে এইসব উৎপাদন সংগঠনকারী বা তত্ত্বাবধায়করা নিজেদের মালিকে পরিণত করলেন। এইভাবে সমাজ দুভাগে বিভক্ত হয়; শ্রমিকশ্রেণী ও মালিক বা শাসকশ্রেণী। অতএব, শ্রেণীসমাজের আবির্ভাব হল উৎপাদন পদ্ধতিতে উন্নতির ফলে।

শ্রেণী-পূর্ব মানুষের প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও উৎপাদনশক্তি ছিল অপরিণত, উৎপাদন কৌশলও ছিল দুর্বল। এই কৌশলের দুর্বলতা তারা পুরণ করতে চায় ইন্দ্রজালের দ্বারা। ইন্দ্রজাল এক মায়াবী শক্তি, যার দ্বারা মানুষের ইচ্ছাশক্তির বলে প্রকৃতিকে বশীভূত করার চেষ্টা চলে। শ্রেণীসমাজে মানুষ অপেক্ষাকৃত উন্নত পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার ফলে ক্রমশ প্রকৃতিকে বুঝতে আরম্ভ করে এবং নিজেদের বশে আনতে শুরু করে। কিন্তু যেহেতু সমাজ তখন বিভক্ত হয়ে পড়েছে, মালিক বা শাসকগোষ্ঠী নিজেদের বিশেষ অধিকারগুলিকে, ঐশ্বরিক অনুগ্রহের দোহাই দিয়ে, বেশি করে কায়েম করার জন্য ইন্দ্রজাল কৌশলের আশ্রয় নেয়। এইভাবে শ্রমিকগোষ্ঠী বা উৎপাদনকারীরা প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের কৌশল সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার ফলে ইন্দ্রজাল কৌশলের অধিকারীদের ইচ্ছা অনুসারে নিজেদের ভাগ্য মেনে নিতে বাধ্য হয়। শ্রেণীসংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে এই যে ইন্দ্রজালের সৃষ্টি, এরই এক রূপান্তর হল ধর্ম। প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে আদিম

মানুষের দুর্বলতা রূপ নিয়েছে ইন্দ্রজালে, আর সমাজে উন্নত উৎপাদনশক্তির সামনে সভ্য মানুষের দুর্বলতা রূপ নিয়েছে ধর্মবিশ্বাসে।

ধর্মের মতো বিজ্ঞানেরও উৎপত্তি এই ইন্দ্রজাল থেকে। কিন্তু ধর্ম বাড়িয়ে তুলল নেতিবাচক দিকটা, আর বিজ্ঞান তুলে ধরল ইতিবাচক দিক। অজ্ঞাতের সামনে অক্ষমতার প্রকাশ ধর্মে, আর জ্ঞাত বিষয়ের উপর ক্ষমতার প্রকাশ বিজ্ঞানে। ধর্ম ও বিজ্ঞান দুই ধারণাই অবশ্য দীর্ঘদিন অভিন্ন ছিল। আদি বিজ্ঞানীরা ছিলেন ধর্মযাজক, যাঁরা ইন্দ্রজালের অধিকারী হিসাবে ক্ষমতা দখল করে রাখতেন, সাধারণ অধিবাসীদের দ্বারা পূজিত হতেন। প্রথম যুগে পুরোহিত বা ধর্মযাজক ও ঈশ্বরকে অভিন্ন ভাবা হতো, পরবর্তীকালে পুরোহিতরা ঈশ্বরের প্রতিনিধি বা অবতার রূপে পুজিত হতেন। যেভাবে পুরোহিতের কাছে আবেদন করা হতো, নানা উপকরণ দিয়ে তাঁদের সম্মান দেখানো হতো, সেইভাবেই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা ও বলিদানের ব্যবস্থা শুরু হয়। ঈশ্বর সম্বন্ধে এই ধারণার উৎপত্তি হয় গোষ্ঠীপতি সম্বন্ধে কল্পনা থেকে।

আদিম জীবন থেকে সভ্যজীবনে উৎক্রান্তির চূড়ান্ত পদক্ষেপ কৃষিবিদ্যা আবিষ্কার। কিন্তু কৃষিকার্য অপেক্ষাকৃত কঠিন কাজ ছিল বলে জমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য ইন্দ্রজালের প্রভাব আরও বিস্তৃত হয়। প্রথম যুগে জমিচাষের কাজটা প্রধানত মেয়েরাই করত, আর পুরুষরা করত শিকার ও পশুপালন। অর্থনৈতিক জীবনে স্ত্রীজাতির স্থান অনুসারেই সমাজে তাদের স্থান নির্ণীত হতো। স্ত্রী-প্রধানেরাই সমাজ শাসন করত, ধর্মতন্ত্রও ছিল মাতৃপ্রধান। কালক্রমে স্ত্রীজাতির প্রাধান্য কমে যায়, কারণ যুদ্ধবিগ্রহ ক্রমেই বেড়ে গেল এবং এগুলি প্রধানত পুরুষদের কাজ ছিল বলে ধনসম্পত্তিও তাদের হাতে চলে গেল। এইভাবে ধর্মজগতেও পুরুষদের প্রাধান্য বাড়ল এবং স্ত্রীজাতি পিছনে পড়ে গেল। পুরাকালীন চিন্তায় জন্ম ও মৃত্যু ছিল পরিবর্তনের এবং শাশ্বত ধারার এক অবিচ্ছেদ্য দ্বৈত প্রকাশ। শিশু যৌবনপ্রাপ্ত হওয়ার পর দীক্ষাকাণ্ডের মাধ্যমে পুর্ণবয়স্ক স্তরে উন্নীত হতো; ধারণা ছিল যে, দীক্ষাগ্রহণকারীর শিশু হিসাবে মৃত্যু হল। আদিম সমাজে দীক্ষানুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল নব যুবককে শরীর, মন ও সামাজিক দিক দিয়ে পূর্ণবয়স্কের জীবনের বাস্তব দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেওয়া। পরবর্তীকালে, উন্নত ধর্মীয় ভাবাদর্শগত ক্ষেত্রে আদিম দীক্ষাদান পদ্ধতি পুরোপুরি গৃহীত হল, কিন্তু তাতে কিছু নতুন উপাদান সংযোজিত হয়। এই উন্নত দীক্ষাদান পদ্ধতির উদ্দেশ্য হল, দীক্ষাগ্রহণকারীকে এই পৃথিবীর জন্য নয়, পরলোকের জন্য প্রস্তুত করা। এইভাবে শ্রেণীসংগ্রামে নিপীড়িতদের আর্ত ও ভারাক্রান্ত জীবনের সব আশা আকাঙ্ক্ষা বাস্তব পৃথিবী থেকে সরিয়ে এক কাল্পনিক পরজগতে হারানো-অধিকার ফিরে পাবার আশ্বাস দেওয়া হয় এবং প্রত্যক্ষ সমাজসংগ্রামে তাদের দুর্বলতা রূপ পায় ধর্মে।

সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন সমাজে মানুষের জীবনযাত্রার মান তথা উৎপাদন পদ্ধতি যত উন্নত হয়েছে, মানুষ প্রাকৃতিক শক্তিকে যত বেশি বশীভূত করতে পেরেছে, তাদের সমাজের উপরিতলও তত উন্নত পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে। আর এই উপরিতলের অন্যতম উপাদান হিসাবে ধর্মীয় ভাবাদর্শেরও জটিল ও নতুন নতুন পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। এই ভাবাদর্শ পরবর্তী যুগে প্রচলিত ধারণাসমূহের সঙ্গে সংগতি রেখে বিকশিত হয়েছে এবং সেগুলিকেও আরও বিকশিত করেছে। যাদের মনে এই চিন্তাপদ্ধতি ক্রিয়াশীল থেকেছে যে, চিন্তা নিজস্ব নিয়মাধীন এবং স্বাধীন সত্তা, তাদের বৈষয়িক জীবনের অবস্থাই যে শেষপর্যন্ত এই প্রক্রিয়ার গতি নিয়ন্ত্রণ করে, সেকথা অনিবার্যভাবেই তাদের কাছে অজ্ঞাত থেকেছে, কারণ তা না হলে সমগ্র ভাবাদর্শেরই মৃত্যু হয়। মানুষের নিজের প্রকৃতি ও বহির্বিশ্ব সম্পর্কে যে ভ্রান্ত ও আদিম ধারণা থেকে ধর্মের উৎপত্তি সেই আদিম ধারণাগুলি প্রতিটি জ্ঞাতিসম্পর্কমূলক জাতিগোষ্ঠীর ক্ষেত্রেই মোটের উপর সাধারণ। কিন্তু গোষ্ঠীগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে প্রতিটি বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীর ভাগ্যে জীবনধারণের যে অবস্থা ঘটে সেই অবস্থা অনুসারে বিশেষ গোষ্ঠীগত ধরনে তা বিকশিত হতে থাকে। ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মীয় ভাবাদর্শ অনুসারে বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়। আবার এই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে সেই সমাজের বনিয়াদের উপর গড়ে ওঠা বিশেষ ধরনের রাষ্ট্রযন্ত্রের বা শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে একটা সম্পর্ক স্থাপিত হয়। অন্যদিকে আবার সেই নির্দিষ্ট সমাজব্যবস্থায় যারা অসহায় ও জীবন-নির্ধারক বহিঃশক্তির কাছে নিপীড়িত, তারাও আত্মরক্ষা ও সান্ত্বনার জন্য ধর্ম বা ঈশ্বরের আশ্রয় খোঁজে। প্রকৃতপক্ষে, ঈশ্বর দুজন একজন শোষিতের ঈশ্বর, যে ঈশ্বর দুঃখবেদনার প্রতিমূর্তি এবং মুক্তির, আশার প্রতীক হিসাবে পুজিত; আর অপরজন শাসকশ্রেণীর ঈশ্বর, যাঁকে বিত্তবানরা ব্যবহার করে নিপীড়িতদের মাধ্যমে সামাজিক ও আর্থিক শোষণকে মানিয়ে নেবার জন্য।

বিভিন্ন দেশে গোষ্ঠীগত ধরন অনুসারে যে যে ধর্মের বিকাশ ও প্রাধান্য লক্ষ করা যায় তদনুযায়ী সমগ্র পৃথিবী মোটামুটি পাঁচভাগে বিভক্ত ছিল ইয়োরোপ ও আমেরিকায় খ্রীস্টধর্ম। পশ্চিম এশিয়ায় ও উত্তর আফ্রিকায় ইসলাম ধর্ম। চীন ও সুদুর পূর্বাঞ্চলে কনফুসিয়ান ও তাওবাদ; ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম; দক্ষিণ, মধ্য ও পূর্ব এশিয়ায় বৌদ্ধধর্ম। এ ছাড়া ইহুদি ধর্ম ও জরথুস্ত্রবাদও যথেষ্ট প্রসার লাভ করে। সর্বদেশেই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি, প্রধানত পুরোহিত বা ধর্মযাজকেরা, সংগঠিতভাবে সমাজে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অবধায়কের স্থান অধিকার করেন। প্রচলিত ধর্মীয় জ্ঞানের ভিত্তিতে বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র ও বাধ্যতামূলক আচরণবিধি রচিত হয়। এবং সাধারণ মানুষকে বোঝানো হয় যে এইসব শাস্ত্র ও আচরণবিধি অভ্রান্ত।

প্রতিটি জাতির মধ্যে যে দেবতারা আধিপত্য করেছেন, তাঁরা জাতীয় দেবতা; এবং যে জাতীয় সীমানা রক্ষা করা তাঁদের দায়িত্ব, তাঁদের প্রভাব তার বাইরে যায়নি। যতদিন পর্যন্ত একটি জাতির সত্তা বর্তমান শুধুমাত্র ততদিনই লোকেদের কল্পনায় এই দেবতাদেরও অস্তিত্ব; জাতির পতনের সঙ্গে সঙ্গে দেবতাদেরও পতন হয়। যে

কোনো ধর্ম একবার গড়ে ওঠার পর তার মধ্যে একটা ঐতিহ্যগত উপাদান কিন্তু বর্তমান থেকেই যায়, কারণ ভাবাদর্শের প্রতিটি ক্ষেত্রেই ঐতিহ্য হল একটা মস্ত রক্ষণশীল শক্তি। কিন্তু সমাজের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই উপাদানের যে গুণগত রূপান্তর ঘটে তা আসে শ্রেণী সম্পর্ক থেকে, আর্থাৎ যে মানুষেরা এই রূপান্তর ঘটায় তাদের বৈষয়িক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক থেকে। অর্থনৈতিক সম্পর্ক পরিবর্তিত হয় প্রচলিত উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে, যেটা মূলত নির্ভর করে প্রাকৃতিক শক্তিকে কতটা বশীভূত করা গেছে তার উপর। প্রাকৃতিক শক্তিকে আয়ত্ত করার কাজ বিজ্ঞানের, সুতরাং বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের রূপান্তর অবশ্যম্ভাবী। বিজ্ঞান হচ্ছে এমন এক ধরনের প্রক্রিয়া যার মূলে আছে এই চিন্তা যে, এই জগৎ প্রাকৃতিক নিয়মে পরিচালিত বস্তুগত বিকাশপদ্ধতি, এবং মানুষ যে পরিমাণে এই বিকাশ পদ্ধতিকে জানতে পারে সেই পরিমাণে সে তাকে প্রভাবিত করতে পারে। বিশ্বাসের দৃষ্টি দিয়ে দেখলে যে ঘটনাকে ঈশ্বরের ইচ্ছা বলে মনে হয়, বৈজ্ঞানিক অনুশীলনে তাকেই বস্তুগতভাবে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উপায়ে, বিশ্লেষণযোগ্য ঘটনা বলে বোঝা যায়। প্রকৃতপক্ষে, যে পরিমাণে বিজ্ঞান বিকাশ লাভ করে সেই পরিমাণে ধর্মও লোপ পায়।

মার্কসবাদ বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের মতবাদ। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ও দ্বন্দ্বতত্ত্বের যেসব নিয়মের দ্বারা প্রকৃতি ও সমাজের বিকাশ নিয়ন্ত্রিত হয় তার বিজ্ঞান হিসাবে, বিশ্বের বিপ্লবী রূপান্তরের বিজ্ঞান হিসাবে, মার্কসবাদ সামগ্রিকভাবে ভাববাদ বিরোধী। যেহেতু বিজ্ঞান নিরূপিত তথ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত, সেই জন্য এই মতবাদ মৌলিকভাবে ধর্ম ও ঈশ্বরবিরোধী।

মার্কস তাঁর ধর্মীয় ভাবাদর্শ সম্পর্কিত বক্তব্যের প্রথমেই বস্তুবাদী দর্শনের সঙ্গে ধর্মের বিসংবাদী সম্পর্কটি তুলে ধরেছেন। দর্শনের বিশ্ববিজয়ী মুক্ত হৃদয়ে যতক্ষণ বিন্দুমাত্র রক্ত প্রবাহিত হবে দর্শন ততক্ষণ এপিকিউরাসের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বলে যাবে জনগণের ঈশ্বরকে যে পরিত্যাগ করে সে নয়, ঈশ্বর সম্বন্ধে জনগণের অভিমতে যে নিবিষ্ট হয় সে-ই অধর্মাচারী। ঈশ্বরকুলের বিরুদ্ধে প্রমিথিউসের ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা ঘোষণা প্রকৃতপক্ষে স্বর্গ ও মর্ত্যের সমস্ত দেবতাদের বিরুদ্ধে দর্শনেরই জেহাদ ঘোষণা, কারণ এই দেবতারা মানুষের সচেতনতার কোনো মূল্য দেয়নি। এ জন্য যদি কেউ সামাজিক স্তরে দর্শনের আপাত অধঃপতনের কথা বলে, তাহলে দর্শন প্রমিথিউসের মতোই জবাব দেবে দাসত্বসুলভ হীনতার চেয়ে, জিউসের গোলামি করার চেয়ে, পর্বতে শৃঙ্খলিত হয়ে থাকা অনেক ভাল। ককেসাসের পর্বতে শৃঙ্খলিত প্রমিথিউস মানুষকে মুক্তির আলো দেখায়, যার ফলে প্রাচীন গ্রীক দেবকুলের পতন শুরু হয়। তাই মার্কস দর্শনের কালপঞ্জিতে প্রমিথিউসকে মহত্তম শহীদ বলে বর্ণনা করেছেন।

মার্কস ও এঙ্গেলস ইতিহাস থেকে নজির দিয়ে দেখিয়েছেন যে, ঈশ্বরে অনাস্থা বা নিরীশ্বরবাদ প্রগতির অন্যতম লক্ষণ। গ্রীসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলিতে গণতন্ত্রের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে প্রচলিত ধর্মগুলিও বিপর্যস্ত হতে শুরু করে। এ জন্য অনেকাংশেই বিদ্যমান ধর্মগুলির নৈতিক অবক্ষয় দায়ী, যদিও মূলত ধর্মগুলির পতনের কারণ ছিল বিজ্ঞান ও দর্শনের উন্নতি। সঙ্গে সঙ্গে যুক্তিবাদ, এবং কোনো-কোনো ক্ষেত্রে সংশয়বাদও, প্রাধান্য লাভ করে; প্রকৃতিবিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে, সমস্ত শিক্ষিত ব্যক্তিই ঐশ্বরিক ক্ষমতা, দৈবজ্ঞ বাণী বা অলৌকিক ব্যাপারকে মূল্য দিতে অস্বীকার করে। গণতন্ত্রের উত্থানের সঙ্গে সম্ভ্রান্তগোষ্ঠীর শাসন ও বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে ধর্মীয় আনুগত্যের অবসান দেখা দেয়।

মার্কস ও এঙ্গেলস নির্দিষ্ট সামাজিক অবস্থায় খ্রীস্টধর্মের উৎপত্তি ও সমাজ-বিকাশের বিভিন্ন স্তরে এই ধর্মের পরিবর্তনের যে বিশ্লেষণ করেছেন তার একটু সংক্ষিপ্ত বর্ণনা থেকে সাধারণভাবে ধর্ম সম্বন্ধে তাঁদের মূল বক্তব্য স্পষ্ট বোঝা যাবে রোমের অধীনে গ্রীসের এবং নিকট প্রাচ্যের প্রাচীন রাজ্যগুলি ও তার সঙ্গে গল ও স্পেনের অনগ্রসর গোষ্ঠীগুলি একটি সম্রাট-শাসিত রাষ্ট্রে সংহত হয়। ফলে, দাস অর্থনীতির আভ্যন্তরীণ সমস্ত স্ববিরোধিতা প্রবল হয়ে ওঠে। উৎপাদনের তখন যা স্তর ছিল তাতে ক্রীতদাসের শ্রম অধিক লাভজনক ছিল এবং নতুন কোনো আবিষ্কারেরও বিশেষ সুযোগ ছিল না। পরবর্তীকালে দাস-শ্রমপ্রথায় লাভের অঙ্ক যখন ফুরিয়ে আসে তখন নতুন কোনো শ্রমপ্রথা প্রবর্তন করা কঠিন হয়ে ওঠে। এইভাবে রোম সাম্রাজ্য এমন একটা যুগে এসে প্রবেশ করে যখন অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ধীরে ধীরে তার ভাঙন শুরু হয়; সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক ও আত্মিক দিক দিয়েও রোম সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি আরম্ভ হয়। ক্রমে ম্লান হয়ে যায় পুরনো জাতীয় দেবতাগুলি, এমন কি রোমের সংকীর্ণ পরিধির পক্ষে উপযোগী স্থানীয় দেবতারাও লুপ্ত হয়। সাম্রাজ্য যখন ভেঙে পড়তে শুরু করে, সীমান্তের দেশগুলি যখন প্রতি-আক্রমণ আরম্ভ করে তখন রোমের শোষিত শ্রেণী তাদের অভ্যর্থনা জানায়, যার ফলে ভাঙন দ্রুততর হয়; তখন তার অভ্যন্তরে সমস্ত শ্রেণীই, শোষক ও শোষিত নির্বিশেষে এক হতাশায় মগ্ন হয়ে পড়ে। এই অবস্থা ধর্মবিশ্বাস, ধর্মোন্মত্ততা ও নানা ধরনের অজ্ঞতাবাদ বিস্তারের এক সুযোগ করে দেয়। তাছাড়া, তখন একটা বিশ্বধর্মেরও যে প্রয়োজন ছিল, রোমে স্থানীয় দেবতাদের সঙ্গে যে সব বিদেশী দেবতাদের সামান্যমাত্র সম্মান ছিল তাদের জন্য স্বীকৃতি ও বেদী জোগানোর প্রচেষ্টায় তা স্পষ্ট হয়। ইতিমধ্যেই নিঃশব্দে সাধারণীকৃত প্রাচ্য এবং ইহুদি ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে স্থূল গ্রীক, বিশেষত স্টোইক দর্শনের মিশ্রণ থেকে নতুন বিশ্বধর্মের (রোমক বিশ্ব সাম্রাজ্যে) অর্থাৎ খ্রীস্টধর্মের আবির্ভাব হয়।

(চলবে)

স্বাধীনতা সংগ্রামী , আইনজ্ঞ ও মহান দানবীর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ

শান্তনু দত্ত চৌধুরী

১

আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম নেতা চিত্তরঞ্জন দাশ।

বিক্রমপুরের(বর্তমান বাংলাদেশের মুন্সীগঞ্জ জেলা, টঙ্গীবাড়ী উপজেলার)তেলিরবাগ গ্রামে এক বিখ্যাতউচ্চ মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বৈদ্য 'দাশ' পরিবারে ১৮৭০ সালের ৫ নভেম্বর। তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রয়াত হন ১৯২৫ সালের ১৬ জুন।এই বছর তাঁর মৃত্যুর শতবর্ষ পূর্ণ হচ্ছে ।আত্মবিস্মৃত বাঙালি ও ভারতবাসি হয়তো তাঁকে ভুলেই থাকবে।

চিত্তরঞ্জনের পিতা ভুবন মোহন দাশ কলকাতা হাইকোর্টের সলিসিটার ছিলেন। জীবিকার তাগিদে তিনি বিক্রমপুরথেকে কলকাতায় গিয়ে বসবাস করতেন। ভুবন মোহন দাশেরবড় ভাইয়ের নাম দুর্গামোহন দাশ। তিনিও বিখ্যাত আইনজীবী ছিলেন।

চিত্তরঞ্জন ইংল্যান্ড থেকে ব্যারিস্টারি শিক্ষা সম্পূর্ণ করে এসে ১৮৯৪ সালে কলকাতা হাইকোর্টে ব্যারিস্টার হিসেবে নিজের নাম তালিকাভুক্ত করেন।

১৯০৮ সালে মানিকতলা বোমার মামলায় বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষের বিচার তাঁকে পেশাগত মঞ্চের সম্মুখ সারিতে নিয়েআসে। তিনি এত সুনিপুণ দক্ষতায় মামলাটিতে বিবাদী পক্ষ সমর্থন করেন যে অরবিন্দকে শেষপর্যন্ত বেকসুর খালাস দেওয়া হয়। এই মামলায় চিত্তরঞ্জন কিভাবে বিপ্লবীদের পক্ষে দাঁড়ান সে প্রসঙ্গে উপেন্দ্রনাথবন্দোপাধ্যায় তাঁর 'নির্বাসিতেব. আত্মকথায়' লিখেছেন --'ম্যাজিস্ট্রেট সমগ্র মামলাটি আগেই আলিপুর সেশন কোর্টে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এইবার সেখানে বিচারশুরু হল। দু/ একজন ছাড়া মামলা চালানোর ক্ষমতা দলের কারো ছিল না। অরবিন্দ ঘোষের জন্য যে চাঁদা উঠেছিল তার থেকেই উকিল ব্যারিস্টারদের কম সম করে দিয়ে মামলা চালানো হচ্ছিল। যাদের তাতে পোষাল না তারা উপেন্দ্রনাথের ভাষায় 'দু চারদিন পরেই সরিয়া পড়িলেন ; শেষে শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ অর্থের মায়া ত্যাগ করিয়া আমাদের মোকদ্দমা চালাইতেলাগিলেন ।'

তিনি ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় (১৯১০-১১) বিবাদী পক্ষের অর্থাৎ বিপ্লবীদের পক্ষে কৌশলী ছিলেন। তিনিদেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয়আইনেই দক্ষ ছিলেন।

চিত্তরঞ্জন দাশ ছিলেন বেঙ্গলপ্যাক্ট এর প্রবক্তা। এই প্যাক্ট বাংলায় হিন্দু মুসলমান ঐক্যকে সুদৃঢ় ভিত্তিব ওপর প্রতিষ্ঠিত করে।

১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল পাঞ্জাবের জালিয়ানওলাবাগে নিরস্ত্র জনতারও পর গুলিচালনার বিরুদ্ধে দেশব্যাপী তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। কংগ্রেস দল সরকার নিযুক্ত হান্টার কমিশন বয়কট করে। জাতীয় কংগ্রেস প্রকৃত ঘটনার সত্য উদঘাটনের জন্য তাঁকে ও পন্ডিত মতিলাল নেহরুকে যৌথ দায়িত্ব দিয়ে পৃথক তদন্ত কমিটি গঠন করে। তাঁদের রিপোর্টে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মুখোশ উন্মোচিত হয়।

১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনে বাংলায় দেশবন্ধুর নেতৃত্বে বিপুল সংখ্যক মানুষ কারা বরণ করেন। তিনিও স্ত্রী, পুত্র ও ভগ্নিসহ গ্রেপ্তার হন। ১৯২১-এ অহিংস অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলে বাংলার জেলগুলি সত্যাগ্রহী বন্দীতে ভরে যায়। আর লোক রাখার জায়গা থাকল না। এই আন্দোলনে মেয়েরাও যোগ দিতে এগিয়ে আসেন ও অত্যাচার সহ্য করেন। অবশেষে সরকার আর কাউকে জেলে না পাঠিয়ে, প্রহার করে পুলিশের লড়িবোঝাই করে মাঝরাতে পনের-বিশ মাইল দূরকোন এক জায়গায় তাঁদের ছেড়ে দিয়েআসতো। অনুশীলন সমিতির নেতা ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী , যাঁকে বিপ্লবী আন্দোলনের মহারাজ বলা হয়, তিনি তাঁর 'জেলে ত্রিশবছর ও পাক-ভারতেরস্বাধীনতা সংগ্রাম' গ্রন্থে আলিপুর সেন্ট্রালজেলে তাঁদের সঙ্গে কংগ্রেস নেতৃত্বের গভীর সখ্যতা সম্পর্কে লিখেছেন।

ওই সময় আলিপুর সেন্ট্রাল জেলেবন্দী করে নিয়ে আসা হয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল প্রমুখ নেতৃবৃন্দকে ।

কারা মুক্তির পর তিনি ১৯২২ সালে কংগ্রেসের গয়া অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। তিনি দেশের স্বার্থে এই সময় নিজের বসতবাড়ি দান করে দেন। ওকালতি ত্যাগ করেন। জনসাধারণ তাঁকে 'দেশবন্ধু' বলে সম্বোধন করেন। দেশের সর্বাধিক আয় সম্পন্ন ব্যারিস্টার চার আনার খদ্দর পরিহিত সর্বত্যাগী কংগ্রেসীতে পরিণত হন।

চিত্তরঞ্জন দাস বাংলার বহু রাজনৈতিক নেতার রাজনৈতিক গুরু। তাঁদের মধ্যে সুভাষচন্দ্র বসু ,হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, ডা. বিধান চন্দ্র রায়, শরৎ চন্দ্র বসু, জ্যোতিন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

তিনি ও মতিলাল নেহরু ১৯২৩ সালে 'স্বরাজ্য দল' গঠন করেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল পরিষদীয়রাজনীতির ভিতরে প্রবেশ করে সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরোধিতা করার কথা ভাবতে হবে।

উদার মতবাদ ও দেশের প্রতি দরদের কারণে তিনি হিন্দু মুসলমান সকলের শ্রদ্ধা ও ভালবাসাঅর্জন করেন এবং তার এই উদার মতবাদের জন্য জনগণ তাকে 'দেশবন্ধু' খেতাবে ভুষিত করেন।

(চলবে)